আনন্দদীপ

সত্যানন্দ ছাত্রাবাস

দ্বিতীয় বর্ষ।। প্রথম সংখ্যা
১৫ ডিসেম্বর ২০২৪

…ানন্দদেব

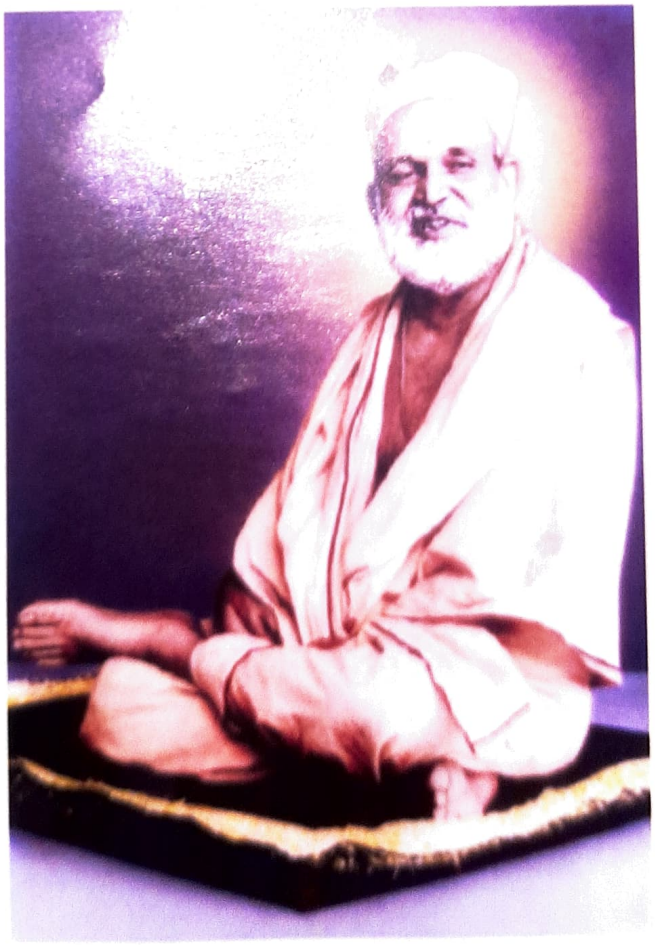

স্বামী সত্যানন্দদেব

সাঁইথিয়া সত্যানন্দ ছাত্রাবাস

(স্থাপিত : ১৯৭০)

আনন্দদীপ

(ছাত্রাবাস প্রাক্তনীবৃন্দের মুখপত্র)

২য় বর্ষ ।। ১ম সংখ্যা
২০২৪

সাঁইথিয়া
বীরভূম-৭৩১২৩৪

সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের প্রাক্তনীবৃন্দের কার্যকরী সমিতি
[Ececutive Committee]
২০২৩-২৪

সভাপতি (President)	:	মহঃ মোস্তফা কামাল
সহ-সভাপতি (Vice-President)	:	আকাশ ভট্টাচার্য
	:	সুজিত কুমার দাস
সম্পাদক (Secretary)	:	পলাশ ব্যানার্জী
সহ-সম্পাদক (Joint Secretary)	:	বুবুল সরকার
কোষাধ্যক্ষ (Treasurer)	:	মানবেন্দ্র রায়
সহ-কোষাধ্যক্ষ (Asst.Treasurer)	:	গিরিধারী দাস

সদস্য (Member)

ভূমানন্দ সিনহা, শোভন মুখোপাধ্যায়
সাগর কুমার দাস, শিবাশিস মণ্ডল
সন্দীপ দাস, সুধীরঞ্জন গাঙ্গুলি
পলাশ সিনহা, আবু তাহের মাসুম রাজা
মলয় দাস, সুনীত সাহা
পিন্টু মুখার্জী, রঞ্জিত কুমার সেন
সুব্রত সাহা, জীবানন্দ ভট্টাচার্য

পত্রিকা কমিটি

উপদেষ্টা মণ্ডলী (Advisory Committee)	:	জলদবরণ দত্ত, শোভন মুখোপাধ্যায়, ভূমানন্দ সিনহা, সুধীরঞ্জন গাঙ্গুলী, পলাশ সিনহা, বুবুল সরকার, তাপস সাহা
সভাপতি (President)	:	মহঃ মোস্তফা কামাল
প্রকাশক (Publisher)	:	পলাশ ব্যানার্জী
প্রকাশকাল	:	১৫ ডিসেম্বর, ২০২৪
সম্পাদকমণ্ডলী (Editors)	:	অনিমেষ মণ্ডল, কুণালকান্তি সিংহরায়, সুরজিৎ রায়, রঞ্জিত কুমার সেন
প্রচ্ছদ (Cover)	:	কুণালকান্তি সিংহরায়
মুদ্রণ	:	সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান যোগাযোগ : ৭৯০৮০৫৯৯৪৭

শোকবার্তা

বিগত বছরে আমরা যাদের হারিয়েছি :

দিলীপ মজুমদার (প্রবেশবর্ষ ১৯৬৬)

মানব যশ (প্রবেশবর্ষ ১৯৮৫)

অরিন্দম চ্যাটার্জী (প্রবেশবর্ষ ১৯৯৪)

সন্তোষ পাল (প্রবেশবর্ষ ১৯৯৫)

স্মৃতিভারাতুর হৃদয়ে আমরা তোমাদের স্মরণ করি। আমাদের এই বিরাট সংসারের আজকের এবং ভবিষ্যতের প্রতি পদক্ষেপে তোমরা আমাদের সঙ্গে আছো এবং থাকবে—তোমাদের স্মৃতির প্রতি এ আমাদের আন্তরিক অঙ্গীকার।

—সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের সকল প্রাক্তনীবৃন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন
RAMAKRISHNA MATH &
RAMAKRISHNA MISSION

২৭, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩, বাংলাদেশ
ফোন ঃ +৮৮০-২-২২৩৩৮৩৭০৩, ২২৩৩৮৪০৫৫
27, Ramakrishna Mission Road, Dhaka-1203, Bangladesh. Phone: +880-2-223383703, 223384055
Email: dhaka@rkmm.org, rkmdhaka.bd@gmail.com, Website: www.dhakarkmm.org

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

আশীর্বাণী

সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের শিক্ষার্থীবৃন্দ গতবছরের ন্যায় এবারও 'আনন্দদীপ' পত্রিকা প্রকাশ করবে জেনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

স্বামীজীর শিক্ষা চিন্তা বর্তমান যুগের গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এক ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে। স্বামীজীর নিকট শিক্ষা শুধুমাত্র জীবিকা লাভের উপায়ই নয়, বরং তা হলো একজন শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নতি নিশ্চিত করবার একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। তাঁর ভাষায় ঃ "আমাদের অন্তরে যে পূর্ণতা প্রথম থেকে বিদ্যমান রয়েছে তার বিকাশসাধনই হলো শিক্ষা।" শিক্ষার সেই উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে তিনি সঠিক উপায়ও আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। উপায়সমূহের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন মনোযোগ অভ্যাসের ওপর, দ্বিতীয় গুরুত্ব দিয়েছেন অনাসক্তি এবং তৃতীয়, নিঃস্বার্থপরতার ওপর। স্বামীজী উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই তিনটি গুণের অধিকারী হলে একজন শিক্ষার্থী সহজেই যেকোন বিষয়ে জ্ঞানলাভে সমর্থ হবে এবং সমাজের একজন আদর্শবান ও দায়িত্ব সচেতন মানুষে পরিণত হবে।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী মহারাজের নিকট 'আনন্দদীপ' পত্রিকার সার্থক প্রকাশ কামনা করি এবং উক্ত প্রকাশনার সাথে যুক্ত সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

নিত্য শুভানুধ্যায়ী

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
অধ্যক্ষ ও সম্পাদক

সূচিপত্রে

কার্যকরী কমিটির সম্পাদকের কলম	পলাশ ব্যানার্জী	৬
কার্যকরী সমিতির সভাপতির কলমে	মহঃ মোস্তফা কামাল	৭
পত্রিকা সম্পাদকের কলমে.....		৮
বিশেষ নিবন্ধ		
ঠাকুর সত্যানন্দের আলোকে আমার জীবন	মিহির কুমার চন্দ্র	৯
শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে কালী তপস্বী	ড. ভাস্কর কুমার কয়ড়ী	১২
পুলিশের ঘরে সন্ন্যাসী সত্যব্রত থেকে স্বামী সত্যানন্দদেব	বিজয় কুমার দাস	১৫
স্মৃতির আলোয়		
পদক নিয়ে হ্যাপা	জলদবরণ দত্ত	১৮
সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের প্রাক্তন আমি	তাপস সাহা	১৯
EC-র সংসার	বুবুল সরকার	২১
করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে	কমলেশ ঘোষ	২৬
সত্যানন্দ ছাত্রাবাস, স্বপ্ন ও বাস্তবের মেলবন্ধন	সোমপ্রকাশ মুখার্জী	২৯
ভাল্লাগেনা	গিরিধারী দাস	৩০
অমৃত মেঘের বারি	কৌশিক ভট্টাচার্য	৩১
প্রবন্ধ		
এক হৃদয়বান সন্ন্যাসী আর এক মগ্নচৈতন্যের কবি...	অনিমেষ মণ্ডল	৩৪
রিইউনিয়ন : দুই বন্ধুর কাহিনি	কুণালকান্তি সিংহরায়	৩৬
মগজাস্ত্রের মন **money**	সুব্রত কুমার সাহা	৩৯
কবিতা ও ছড়ার কারসাজি		
পুনর্মিলন	সুব্রত চৌধুরী	৪৩
যকৃত	মনোরঞ্জন ঘোষ	৪৩
ওরা শপথ নেয় কসমও খায়	মোহাম্মদ সাদউদ্দিন	৪৪
সমাকলন	সিদ্ধার্থ ঘোষ	৪৪
হারানো শ্রাবণ	করুণাসিন্ধু মণ্ডল	৪৫
ভয়াবহভাবে ভালোবাসলে	অনিরুদ্ধ দাস	৪৫
আমাকে তুমি চুপ করিয়ে দিলে	সুজিত কুমার দাস	৪৬
স্মৃতিগাঁথা	বিষ্ণুচরণ পাল	৪৭
খোলা আকাশের নীচে বসতি আমার	ওয়াকিফ মোহাম্মদ সাহিন	৪৭
নারীদুর্গা	আবু তাহের মাসুম রাজা	৪৮
প্রগতি	মহঃ শুকুরুদ্দিন মল্লিক	৪৮
অরন্তুদ তুমি অরুন্ধতী	কেরামত আলী	৪৯
বাতিঘরের ভালোবাসা	রঞ্জিত কুমার সেন	৪৯
গল্পের সময়		
অচ্ছেদ্য বন্ধন	সন্দীপ দাস	৫১
সেই চাঁদের রাত্রি	সাগর কুমার দাস	৫২
সেই কথাময় কুয়াশারা	সুরজিৎ রায়	৫৬
A LIVING WITNESS : AN ESSAY THROUGH THE EYES OF A TREE	Sandip Goldar	৬০
অন্যরকম		
টুকরো কথা		৬২
৫ই অক্টোবর—এক বাতিঘরের কাহিনি		৬৯

কার্যকরী কমিটির সম্পাদকের কলম

প্রিয়জন বন্ধুরা,

আরও একটা বছর পেরিয়ে আমরা ষষ্ঠ পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে আবার সামিল হলাম। আমরা যারা কোন এক সময় সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের আবাসিক ছিলাম, সারা বছরের অন্তঃসলিলা অপেক্ষার অবসানে তারা সবাই আজ আবার এক ছাতার তলায় এসে দাঁড়িয়েছি—পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে। প্রত্যেকে প্রচুর ব্যস্ততার মধ্যেও একটা দিনের জন্য ফিরলাম অতীতে। বেছে নিলাম বন্ধুত্বকে, ভ্রাতৃত্বকে।

কার্যকরী কমিটির (EC) তরফে বলতে পারি, আমরা সর্বদা আমাদের হাত দুটো বাড়িয়ে রেখেছি। তাতে, বিগত বছরে আমাদের মধ্যে সম্পর্কের সেতুগুলো আরও সুদৃঢ় হয়েছে। বিপদে ছুটে গেছি যতটা পেরেছি। মৃত্যুসংবাদে পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। প্রাক্তনীদের লেখায় সমৃদ্ধ পত্রিকা 'আনন্দদীপ' দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। হয়ত যতটা চেয়েছিলাম ততটা কাজ করতে পারিনি। কিন্তু অবিরাম যোগাযোগের মাধ্যমে আশ্বাস ছড়িয়ে দিয়েছি আমাদের সকল প্রান্তের প্রাক্তনী ভাই-বন্ধু-দাদাদের যে, আমরা সবাই সবার জন্যে আছি।

প্রবেশবর্ষ ১৯৬৬ থেকে ২০১৩ সাল—এক দীর্ঘ সময়ের বিস্তারের, প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সের পার্থক্যের এক অসাধারণ মিলনস্থল আজ আমাদের সত্যানন্দ ছাত্রাবাস। মহীরুহ থেকে চারাগাছ, অ্যামিবা থেকে স্যাপিয়েন্স—জানিনা ভ্রাতৃত্বের এমন মহামিলন আর কোথাও হয় কিনা।

ছেড়ে আসা বিক্রি হয়ে যাওয়া বাড়িতে কিছুদিন পর ফিরলে সবকিছু কেমন যেন পর পর লাগে। অবসর নেওয়ার পর পুরনো কর্মক্ষেত্রে গেলে নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে হয়। অথচ মাত্র কয়েকটা বছর কাটিয়ে যাওয়া আমাদের হস্টেল, আমাদের প্রাণের সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের সামনে এসে দাঁড়ালে মনে হয় না অধিকারবোধে কোথাও সামান্য কম পড়েছে—আজও।

তাই ফেরা, ফিরে ফিরে আসা, নিজের কাছে, জীবনের কাছে। এই অধিকারবোধ জেগে থাক আজীবন। সঙ্গে থাক বাড়িয়ে দেওয়া হাতগুলো—সবার।

পলাশ ব্যানার্জী

কার্যকরী সমিতির সভাপতির কলমে

প্রাণপ্রিয় সত্যানন্দ ছাত্রাবাস ছেড়ে চলে আসার নিয়মে ছাড়তে হয়েছে, কিন্ত মনের মণিকোঠায় ছাত্রাবাসের স্মৃতি এখনও জ্বলজ্বল করে। কয়েকজন প্রাক্তনীর অক্লান্ত চেষ্টায় আমরা আবার দূরে থেকেও কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। তাই এই সুযোগকে আর আমরা হারাতে চাই না। নতুন করে আবার যে বৃহৎ পরিবার গঠিত হয়েছে—আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় সেই বন্ধন অটুট থাকবে। এই বৃহৎ পরিবারের বন্ধনকে শক্ত করে ধরে রাখার জন্য কমিটি গঠন আর এই কমিটির সকল সদস্যরা তাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় সর্বদা সকলের পাশে থাকার আপ্রাণ লড়াই করে যাচ্ছে। গত বছর সকলের প্রচেষ্টায় 'আনন্দদীপ' পত্রিকা সফল ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এবারেও তার ব্যাতিক্রম হবে না। পুনর্মিলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সশরীরে মিলিত হওয়ার সুযোগ পাই। নানা কারণে অনেকের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আসতে পারে না। তবে যারা সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে আসতে পারে, তারা অনেক আনন্দ নিয়ে প্রাণভরা অক্সিজেন নিয়ে সব ক্লান্তিকে ঝেড়ে ফেলে। নতুন উদ্যমে সংসারের কাজে মনোনিবেশের রসদ পায়। আবার পরের বছর পুনর্মিলন অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করার অঙ্গীকার করে ছাত্রাবাস ছেড়ে নিজ নিজ আবাসে ফেরে। এইভাবেই আমরা হাতে হাত রেখে সকলের পাশে থাকব এবং ভবিষ্যতের দিনগুলো আনন্দমুখরিত হয়ে থাকবে আশা রাখছি।

মহঃ মোস্তফা কামাল

পত্রিকা সম্পাদকের কলমে.....

দেখতে দেখতে একটা বছর পেরিয়ে গেল। আবার পুনর্মিলন উৎসবের ঘন্টাধ্বনি বেজে উঠেছে। আমরাও প্রস্তুত মানসিকভাবে। সময়ের স্রোতে যেসব বন্ধুত্ব বহুদূরে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে তাদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করে তাদের মনের মণিমুক্তোগুলোকে একত্রিত করে 'আনন্দদীপ'-এর পাতায় পাতায় সংকলনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। আনন্দদীপকে আমাদের চিন্তালোকের প্রতিবিম্ব হিসাবে পাবার এই প্রয়াসকে সফল করে তুলতে আমরাও বদ্ধপরিকর। এই আনন্দ যজ্ঞে সকল দাদা, বন্ধু ও ভাইদের সঙ্গে পেতে চাই। নইলে আমরা পরিপূর্ণ হবো কী করে!

২০১১ সাল থেকে ঐতিহাসিক পুনর্মিলন উৎসবের শুরু হয়। ঐতিহাসিক বললাম এই কারণেই যে এই উৎসব সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। নিরন্তর মানুষের বিচ্ছেদ ঘটে চলা আমাদের যান্ত্রিক জীবনের অনিবার্য পরিণতি। তারই বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আমাদের পদক্ষেপগুলি অসহায় হলেও ব্যর্থ হয়ে যায়নি। তাই আমরা উপুর্যপরি কয়েকবছর ধরে এই অনুষ্ঠান চালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছি। পত্রিকাও তার দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল।

এব্যাপারে Executive committee-র সহায়তা মনে রাখার মতো। সভাপতি, সম্পাদক এবং তার সহযোগীরা যেভাবে আমাদের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রেখে এবং মানসিক সমর্থন জুগিয়েছেন তাতে আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়েছে। এই সমন্বয় বজায় থাকলে আমরা বহুদূর যাব এ আমাদের স্থির বিশ্বাস।

পত্রিকা মানে তো শুধু কিছু লেখার সমন্বয় নয়। তার থেকে আরো কিছু। হারিয়ে যাওয়া আনন্দ আর বেদনার ঘনঘটা। একদিন এক ছাদের তলায় যে সমস্ত প্রাণ তাদের কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে কত কলরোল আর অযুত বেদনাবহ নীরবতার সাক্ষী, তারা সব আজ পরিযায়ী পাখির মতো কত কত দূরদেশে থাকে। তারপর খুব শীত এলে সবাই একবার উড়ে এসে সেই প্রাচীন হারিয়ে যাওয়া দ্বীপটিতে বসে হারিয়ে যাওয়া সময়ের গল্প করে। গল্প করতে করতে হারিয়ে যায় সময়ের গর্ভে। অথবা কিছুই হারায় না। ফিরে ফিরে আসে মুহূর্তেরা। যে রকম সমুদ্রের ঢেউ এসে ছুঁয়ে যায় বালুচর.....রৌদ্রের কিরণ লেগে ঝলমল করে ওঠে আদিগন্ত চরাচর....সেই ঝলমলে আলোটুকু ছুঁয়ে থাকব বলে দীপ হয়ে আনন্দ জ্বেলে রাখি আমরা সবাই। অনির্বাণ স্নেহ আর ভালোবাসা দিয়ে গড়ে ওঠা আমাদের সংসার অক্ষয় হোক। সত্যের সংসারে আনন্দ চিরজয়ী হোক।

ঠাকুর সত্যানন্দের আলোকে আমার জীবন

মিহির কুমার চন্দ্র
(প্রাক্তন অধ্যাপক, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়)

জীবনের অনুভূতি এক একজনের কাছে এক এক রকম। কারো কাছে জীবন একটা যন্ত্রনা, কারো জীবন একটা জিজ্ঞাসা, আবার কারো কাছে জীবন ফুলের মতো সুন্দর। জীবনে মান-যশ-অর্থ এসবের মূল্য খুবই কম— এটা 'কাঁচকলা'। জীবনের মূল্যবান সম্পদ হল আধ্যাত্মিক চেতনা লাভ।

স্বনামধন্য সুপরিচিত বরিষ্ঠ (নব্বই-এ পা রেখেছেন) লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বলেছেন ''জীবন হল এক প্যাকেট সময়। রোজ একটু একটু খরচ। সময়ের মালিককে পাওনা গন্ডা সমেত ফিরিয়ে দিতে হবে।''

আমার প্রিয় বন্ধু প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক নারায়ণ সাহার সংযোজন, ''জীবন হচ্ছে মৃত্যুর কাছ থেকে ধার করা কিছু সময়''।

একটা প্রচলিত কথা আছে, জীবন চলে তার নিজের গতিতে। আমার জীবনে এর অন্যথা হয়েছে। আমার জীবনের গতিমুখ নির্দিষ্ট হয়েছে ঠাকুর সত্যানন্দদেবের আশীর্বাদে এবং নির্দেশে। বালক (এগার বছর) অবস্থায় সিউড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ স্কুলের মাঠে সারদা মেলার সময় আমি ঠাকুরের দর্শন লাভ করেছি। ডিসেম্বর মাসের শীতের বিকেলে (হতে পারে সেটা আমার জন্মতিথি ২৯ ডিসেম্বর) মেলায় বিভিন্ন পসরার মাঝে পশ্চিম দিকে মুখ করে ঠাকুর বসে আছেন মেলা আলো করে। ঠাকুরের থেকে একটু দূরে (প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ মিটার) আমি একা কোমরে হাত দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছি। একটু পরে ঠাকুর তাকালেন আমার দিকে এবং শিশুসুলভ দেবদুর্লভ হাসিমুখে নিজের মাথা দু'বার উপর নিচ করলেন। এটাই আমার দেবদর্শন এবং আশীর্বাদ। ঠাকুর বাকসিদ্ধ এবং দর্শনসিদ্ধ। বহু পরে বুঝেছি, এটাই আমার জীবনে ঠাকুরের আশীর্বাদ।

তিনি দিব্যদৃষ্টি দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। সেই সময় আমি তাঁকে চিনতাম না, চেনার কথাও নয়। তবে বুঝতে পেরেছিলাম তিনি একজন বিশিষ্ট সন্ন্যাসী, কারণ সিউড়ি রামকৃষ্ণ আশ্রমের সন্ন্যাসীগণ তাঁকে ঘিরে ছিলেন এবং বহু নারী-পুরুষ তাঁকে প্রণাম করছিলেন। অনেক পরে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছি আমার জীবন ঠাকুরের আশীর্বাদে এবং নির্দেশেই চালিত হচ্ছে। সে কথায় একটু পরে আসছি।

ঠাকুর সত্যানন্দদেবের পূর্বাশ্রমের নাম সত্যব্রত। তিনি উচ্চশিক্ষিত, ধর্মপ্রাণ, আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন পরিবারের সদস্য। ছাত্রাবস্থাতে স্বামী অভেদানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হিসেবে সিদ্ধিলাভ করেন।

ঠাকুরের প্রভাব আমার জীবনে কিভাবে কাজ করে চলেছে সেটা বিস্তারে জানাতে চাই।

আমি ১৯৬৯ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রেডিও ফিজিকস এন্ড ইলেকট্রনিক্স স্পেশাল পেপার নিয়ে এমএসসি পাশ করেছি। এমএসসি ফল বের হবার আগে সাময়িকভাবে কিছুদিন দুবরাজপুর আর বি এস ডি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলাম। স্কুল থেকে শনিবার বিকেলে বাড়ি আসতাম। আবার সোমবার সকালে গিয়ে স্কুল করতাম। এক শনিবার বাড়ি এসে শুনলাম সাঁইথিয়া অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক প্রয়োজন। তখন কলেজের দায়িত্বে আছেন লালমোহনদা। আমার এক নিকট আত্মীয় লালমোহনদার ছাত্র। রবিবার দিন তাকে সঙ্গে নিয়ে লালমোহনদার সঙ্গে দেখা করলাম। এর কয়েক দিন পর অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করতে হয়েছে। পরে শুনেছি ঠাকুর সত্যানন্দদেব নিজে যজ্ঞ করে এই কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।

স্বামী অভেদানন্দ নামাঙ্কিত, ঠাকুর সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠিত এবং স্বামী কৃষ্ণানন্দ পরিচালিত কলেজে কাজ করে আমি ধন্য। অভেদানন্দ-সত্যানন্দ-কৃষ্ণানন্দ এই পরম্পরা কলেজকে অন্য উচ্চতায় স্থাপন করেছে।

আমি কাজ করার সময় দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্য শিক্ষা দপ্তর এবং ইউজিসির কাছে এই কলেজের একটা অন্য মর্যাদা আছে। বিভিন্ন সময়ে ইউজিসির বহু অনুদান আমরা অনায়াসে লাভ করেছি। এসবই ঠাকুরের কৃপা। স্বামী কৃষ্ণানন্দের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগে তাঁর ভালোবাসাও পেয়েছি। কলেজে কাজ করার অবাধ স্বাধীনতা ছিল। উচ্চ গুণমান সম্পন্ন বহু ছাত্র পেয়েছি যারা এখন পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা বা অধ্যাপনা করছেন। কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির উক্তি—''মাস্টার মশাই হবার জন্য বুঝতে পারি আমি কত কম জানি''। ছাত্রদের কাছ থেকেও শিক্ষার সুযোগ ছিল। আগেকার দিনের বেশিরভাগ ভালো ছাত্রই সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের। বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ এবং মালদা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্ররা এসে সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে আবাসিক থেকে কলেজে পড়াশোনা করেছে। সবই ঠাকুর সত্যানন্দদেবের আশীর্বাদের ফল। সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের প্রাক্তন আবাসিকগণ প্রতিবছর পুনর্মিলন উৎসব পালন করেন। ২০২৩ সালে 'আনন্দদীপ' নামে একটা ম্যাগাজিন ছাত্রাবাসের প্রাক্তনীগণ প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন, যেটা গুণমানে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য দাবি করতে পারে।

গত বছর (মার্চ ২০২৩) ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বরানগর 'কাচের মন্দির' দেখে এলাম। ওখানকার দায়িত্বে আছেন আমার বিশেষ পরিচিত প্রকাশ মহারাজ (স্বামী সত্য প্রকাশানন্দ)। তিনি তাঁর পাশের ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই ঘরে ঠাকুরের কম বয়সের একটা ছবি দেখলাম, মুখ ভর্তি ঘন কালো দাড়ি, মুখে সেই অনাবিল শিশুর হাসি। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দু'মিনিট দাঁড়িয়ে দেখে প্রণাম করলাম। প্রকাশ মহারাজ আমাকে ঘুরে ঘুরে সব দেখালেন। এ আমার চরম সৌভাগ্য।

ঠাকুরের আশীর্বাদ আমার জীবনকে ভরিয়ে দিয়েছে, জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় আমি সেটা উপলব্ধি করি। ঠাকুরের আশীর্বাদেই বোধহয় আমার পুত্র 'রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম' স্কুলে এবং 'নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়'-এ পড়ার সুযোগ পেয়েছিল। ছেলের এই সুযোগ সামাজিক এবং মানসিকভাবে আমাকে উন্নীত করেছে।

আসছি নরেন্দ্রপুরের কথায়। স্বামী লোকেশ্বরানন্দজি নরেন্দ্রপুর তৈরি করেছেন, লোকেশ্বরানন্দজি কর্মবীর সন্ন্যাসী। নরেন্দ্রপুরের ছাত্রগণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সুনামের সঙ্গে বিজ্ঞান গবেষণায় মগ্ন আছেন। শুধু বিজ্ঞান কেন, সঙ্গীত এবং সাহিত্যের বহু দিকপাল ব্যক্তি নরেন্দ্রপুর-এর ছাত্র। প্রয়াত বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী স্বপন গুপ্ত (অন্ধ) নরেন্দ্রপুরেরই ছাত্র। আগে কলকাতার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ নরেন্দ্রপুরের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন বিভিন্নভাবে। জানি না আমার পুত্র নরেন্দ্রপুর-এ পড়াশোনার সুযোগ না পেলে এই উচ্চতায় উঠতে পারত কিনা।

কাঁকুড়গাছিতে সুন্দর অবস্থানে আমার ফ্ল্যাট বাড়িও মনে হয় হয়েছে ঠাকুরের সদিচ্ছায়; যে বাড়ি থেকে যোগোদ্যান আশ্রম পায়ে হাঁটার পথ। সকালের দিকে হাওড়া, শিয়ালদা স্টেশন এবং বিমানবন্দর দশ-পনের মিনিটের মধ্যে যাওয়া যায়। কাঁকুড়গাছিতে তিন-চার দিন থাকলে একদিন অন্তত যোগোদ্যানে সন্ধ্যা আরতি দেখে আসি। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছিলেন একদিনের জন্য; যে পুকুরে ঠাকুর পা ধুয়েছিলেন সেই পুকুরের নাম 'রামকৃষ্ণ কুণ্ড'। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব নাকি বলেছিলেন, 'সাধন ভজনের ভালো জায়গা করেছো গো'। কাঁকুড়গাছিতে পাঁচ দিন থাকলে একদিন দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ ঘুরে আসি। এইসব সুযোগ আমি ঠাকুর সত্যানন্দদেবের সদিচ্ছায় লাভ করে ধন্য হয়েছি।

সেই প্রভাবের জন্যই বোধহয় অবসর জীবনে সাধুসঙ্গ এবং আধ্যাত্মিক ভাবনা-চিন্তা নিয়ে আমার সময় কাটছে। বিভিন্ন শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম যথা সাঁইথিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, দুবরাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম এবং সারদা বিদ্যালয়, বরানগর কাচের মন্দির, আলমবাজার আশ্রম এইসব জায়গার সঙ্গে যুক্ত আছি।

বিশিষ্ট সন্ন্যাসী যাঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি এবং আশীর্বাদ পেয়েছি তাদের নাম করছি।

প্রথম নাম স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী। সময়টা ১৯৯৮ সালের আগস্ট মাস, তখন তিনি বেলুড় বিদ্যামন্দিরের দায়িত্বে ছিলেন। প্রায় দশ বারো মিনিট তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। নরম মোলায়েম এবং স্নিগ্ধ গলায় সুন্দর বাংলায় কথা বললেন। বিষয় ছিল আমার ছেলের নরেন্দ্রপুর ছেড়ে বেলুড় বিদ্যামন্দিরে না আসার পরামর্শ। এত সুন্দর বাংলায় কথা বললেন শুনে অবাক হয়ে গেলাম। বাংলাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালো না বাসলে এত সুন্দর বাংলা কথা বলা সম্ভব নয়। সন্ন্যাসী জীবনের প্রথম দিকে তাঁর নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমের কথা শুনেছি।

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম-এ জয়ানন্দজী মহারাজের সঙ্গে আলাপচারিতায় তার দূরদর্শিতা, বক্তব্যের দৃঢ়তা এবং নমনীয়তার পরিচয় পেয়েছি বিভিন্ন সময়ে।

আকালিপুরের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী বাগীশানন্দ মহারাজের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হবার সময় এবং সুযোগ হয়েছে; তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন, আমার পরিবারের খবর রাখেন। তাঁর কাছেই প্রথম শুনলাম জীবনে নির্জন বাসের কথা এবং গুরুত্ব।

স্বনামধন্য বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী দিব্যানন্দ মহারাজের সঙ্গে অল্প সময়ের জন্য আলাপ হয়েছে।

এছাড়াও আমার আপন জনের মতো দুবরাজপুরের আশ্রমের আশু মহারাজ (স্বামী সত্য শিবানন্দ) তিনি আমার সাঁইথিয়া বাড়িতেও এসেছেন, আমাকে দাদা বলেন।

আসলে সত্যানন্দদেবের প্রতিষ্ঠিত কলেজ এবং তাঁর নামাঙ্কিত সত্যানন্দ ছাত্রাবাস থেকে শুধু বিজ্ঞানী, গবেষক, ডাক্তার, অধ্যাপকই তৈরি হয়নি। ডক্টর মোশারফ হোসেন সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। আরো অনেক ছোট বড় তারকা আছেন।

এছাড়াও বেশ কয়েকজন নামকরা সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা আধ্যাত্মিক জগতকে আলোকিত করেছেন। এঁদের সান্নিধ্যে থেকে আমার মনটাও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভাবিত হয়ে উঠেছে। প্রতিবছর পয়লা জানুয়ারি, কল্পতরু উৎসবের দিন কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান আশ্রমে মনোরম পরিবেশে এক বেলা কাটিয়ে আসি, বেশ ভালো লাগে।

অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয় এবং সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের প্রাক্তনীদের মধ্যে প্রথম যে সন্ন্যাসীর নাম করতে চাই, তিনি স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম শঙ্কর। মাধ্যমিকে বীরভূম জেলার সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া শঙ্করকে স্বামী কৃষ্ণানন্দ সাঁইথিয়া অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগে (U.E.Sc) ভর্তি করান। সেই পরীক্ষায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানাধিকারী ছিলেন। স্বামী কৃষ্ণানন্দের পরামর্শে শঙ্কর নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন মহাবিদ্যালয় পড়াশোনা করেই স্নাতক হন। নরেন্দ্রপুরেই স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সান্নিধ্যে আসেন। তারপর তাঁকে আর পিছনের দিকে তাকাতে হয়নি। এরপরই শঙ্কর থেকে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ রূপে তাঁর প্রকাশ ঘটে।

বর্তমানে বেশ কিছুদিন তিনি বাংলাদেশের রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ ও সম্পাদক (ঢাকা) রূপে নিয়োজিত আছেন, এর সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের আধ্যাত্মপিপাসুদের মন্ত্র ও দীক্ষা দান করে চলেছেন।

পূর্ণাত্মানন্দ আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে সন্ন্যাসী হিসাবে আছেন শীর্ষস্থানে। এছাড়াও স্বামী সারদাত্মানন্দ (মধু মহারাজ) আছেন সাঁইথিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান সন্ন্যাসী। এছাড়াও আলমবাজার মঠে দু-তিনজন সন্ন্যাসী আছেন আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। এসব কথা বলে শেষ করা যাবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে কালী তপস্বী

ড. ভাস্কর কুমার কয়ড়ী

(অবসরপ্রাপ্ত সংযুক্ত অধ্যাপক, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়, সাঁইথিয়া)

জন্ম থেকেই তপস্বীর লক্ষণ নিয়ে মা নয়নতারা দেবীর কোল আলো করে একটি শিশুর আবির্ভাব হলো ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২রা অক্টোবর। শিশুটির সর্বাঙ্গে নাড়ি জড়ানো, যেন পদ্মাসনে মৃতপ্রায় অবস্থায় প্রসূত হয়েছিল। চোখে লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে শিশুকে কাঁদানো হয়েছিল, তার ধ্যান ভাঙানোর জন্য। সেদিন ছিল আশ্বিন মাসের দুর্গাপুজার পূর্বে কৃষ্ণা নবমী তিথি—যেদিন অনেক বনেদী বাড়িতে মা দুর্গার ঘট স্থাপন হচ্ছিল। মা নয়নতারা দেবী মা কালীর কাছে একটি পুত্র সন্তানের জন্য আকুল প্রার্থনা করেছিলেন। সেই বিশ্বাসবশতঃ পুত্রের নাম রাখেন কালীপ্রসাদ। পিতা রসিকলাল চন্দ্র ছিলেন ওরিয়েন্টাল সেমিনারী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের খ্যাতিমান শিক্ষক। নিবাস উত্তর কলকাতার ২১ নং নিমু গোস্বামী লেন।

মেধাবী, ধীর ও শান্ত স্বভাব কালীপ্রসাদ বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণিতে অতি উচ্চ স্থান লাভ করতেন। কখনও কখনও ডবল প্রমোশনও পেতেন। সংস্কৃত ভাষায় ছিল বিশেষ আকর্ষণ। তা দেখে তাঁর ওরিয়েন্টাল সেমিনারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাঁকে একখানি 'ছন্দোমঞ্জরী' বই উপহার দেন। বাল্যের এই ছন্দোজ্ঞানের ফলেই পরবর্তীকালে তিনি অনেক সুললিত সংস্কৃত স্তোত্র যথা সারদাদেবী স্তোত্রম, শ্রীরামকৃষ্ণাষ্টকম্, শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্যানম্, শ্রীসারদাদেবী ধ্যানম্ ইত্যাদি রচনা করেন। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে গীতা পাঠ সম্পূর্ণ করেন। শশধর তর্কচূড়ামনি মহাশয়ের বক্তৃতা শুনে এই বয়সেই যোগশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁর পরামর্শে বিখ্যাত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশের কাছে 'পাতঞ্জল যোগসূত্র' এবং 'শিবসংহিতা' পাঠ করেন। বেদান্তবাগীশ বলেন—উপযুক্ত গুরুর কাছে যোগাভ্যাস করা দরকার। এই কথা শুনে এন্ট্রান্স ক্লাসের (বর্তমান দশম শ্রেণি) ছাত্র কালীপ্রসাদ সিদ্ধ গুরুর সন্ধানে ব্যাকুল হলেন। সহপাঠী যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্যের কাছে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সংবাদ পেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'ফুল ফুটলে ভ্রমর আসে।' সেইরকম কালীপ্রসাদ ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে বাড়িতে কিছু না বলে পায়ে হেঁটে অচেনা দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। অনেক দূর এসে জানতে পারলেন যে অনেক আগেই দক্ষিণেশ্বর পেরিয়ে চলে এসেছেন। আবার পশ্চাদপদ হয়ে দুপুরে দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিনীর মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলেন। কিন্তু জানতে পারলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব কলকাতা গেছেন, রাত্রে ফিরবেন। অগত্যা হতাশমনে পরমহংসদেবের ঘরের উত্তর দিকের বারান্দায় ক্লান্ত দেহে বসে থাকলেন। এই সময় আর একজন যুবক শশীভূষণ চক্রবর্তী (পরবর্তীকালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) সেখানে উপস্থিত হলেন। দুপুরে কালীবাড়ির প্রসাদ পেয়ে পরমহংসদেবের কথা প্রসঙ্গে সময় কেটে গেল।

রাত্রি নয়টা নাগাদ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ফিরে আসার পর ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে নিজের পরিচয় দিয়ে কালীপ্রসাদ জানালেন—''যোগ সাধনার জন্য আপনার কাছে এসেছি। আপনি কি আমাকে যোগশিক্ষা দেবেন?'' কিছুক্ষণ মৌন থেকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব উত্তর দিলেন, ''তোমার এই অল্প বয়সেই যোগশিক্ষার ইচ্ছা হয়েছে—এ অতি ভাল লক্ষণ। তুমি পূর্বজন্মে যোগী ছিলে। কিন্তু তোমার একটু বাকি ছিল। এই তোমার শেষ জন্ম। আমি তোমায় যোগশিক্ষা দেব। আজ বিশ্রাম কর। কাল এসো।'' যোগশিক্ষার অনুরাগে প্রায় বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীগুরুর সকাশে উপস্থিত হলেন। উত্তর

দিকের বারান্দায় একটি তক্তপোশে কালীপ্রসাদকে যোগাসনে বসিয়ে ঠাকুর নিজের ডানহাতের মধ্যমাঙ্গুলি দিয়ে জিভে বীজমন্ত্র লিখে দিয়ে ডান হাতের সাহায্যে বুক থেকে শক্তিকে ঊর্ধ্বদিকে আকর্ষণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কালীপ্রসাদ গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আবার শক্তিকে আকর্ষণ করে অধোদিকে নামিয়ে কালীপ্রসাদকে বাহ্যভূমিতে ফিরিয়ে আনলেন। এরপর ঠাকুর ধ্যান সম্বন্ধে বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে সাধক রামপ্রসাদের গানের একটি অংশ শুনালেন—

'শুচি-অশুচিরে লয়ে দিব্যঘরে কবে শুবি।
দুই সতীনে পীরিত হলে তবে শ্যামা মাকে পাবি।।'

আমার জীবনকথা (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫) বইতে স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন, ''শ্রীশ্রী ঠাকুর যখন আমায় 'এই কথা' বলে এই ভাবে আমাকে দীক্ষা দান করেন, তখন কথাগুলির গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। পরে বুঝেছি যে দুইয়ের পারে না গেলে অদ্বৈততত্ত্বরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অনুভূতি লাভ করা দুরূহ। শুচি বা ভালোর জ্ঞান থাকলে অসুচি বা মন্দের জ্ঞানও থাকবে, কেননা দুইয়ের জ্ঞান নিয়েই সংসারে ব্যবহার। অদ্বৈত-ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হলে দুই জ্ঞানের (সৎ ও অসৎ) অতীত হতে হয়। করুণাময় ঠাকুর তাই দীক্ষার প্রথমেই আমায় শুচি-অশুচি এই দ্বৈতজ্ঞানের পারে যাওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। ভেদবুদ্ধিই অজ্ঞান। ব্রহ্মোপলব্ধি লাভ করতে হলে ভেদবুদ্ধি বা দ্বৈতজ্ঞানের পারে গিয়ে অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়।''

এরপর মা ভবতারিণীর মন্দিরে কালীপ্রসাদকে কিছুক্ষণ ধ্যান করতে পাঠালেন। ঠাকুরকে প্রণাম করে বিদায় নেবার কালে ঠাকুর কিছু মিষ্টি প্রসাদ দিয়ে কালীকে 'আবার এসো' এই আমন্ত্রণ জানালেন। কালীপ্রসাদ তার অভীষ্ট লাভ করে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহের বন্ধনে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হলেন। এই নবজন্ম লাভের পর সূচিত হলো এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। যার বিবরণ রামকৃষ্ণ-বেদান্ত সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত আছে। এই অল্প পরিসরে তার বর্ণনা করা অসম্ভব। অতি সংক্ষেপে তার কিছু সঙ্কেত দেওয়া যায়।

ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ-ভক্ত থেকে সেবকে ও ত্যাগী শিষ্যে রূপান্তরিত হয়ে স্বামী অভেদানন্দ নামে ঠাকুরের ষোলজন সন্ন্যাসী শিষ্যের অন্যতম রূপে আত্মপ্রকাশ। স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ মঠে যোগদান, কঠোর সাধনা এবং বেদান্ত চর্চায় 'কালী বেদান্তী' রূপে পরিচয় লাভ। শ্রীমা সারদাদেবীর সাথে আঁটপুর, কামারপুকুর ও জয়রামবাটী গমন এবং শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করার সুযোগ লাভ। পদব্রজে ভারতের অনেক তীর্থস্থান পরিব্রাজক রূপে দর্শন ও সাধনা।

স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন সতীর্থ ও হরি-হর আত্মা। শিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের সাফল্যের পর কলকাতাবাসীর কাছে স্বামীজীর সম্মানার্থে টাউন হলে স্বামী অভেদানন্দ একটি বিরাট সভার আয়োজন করেন। স্বামীজী তাঁর এই গুরুভ্রাতার বেদান্তের জ্ঞান ও বাগ্মিতার বিষয়ে সুপরিচিত ছিলেন। পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারের জন্য স্বামীজী আহ্বান জানালেন তাঁর প্রিয় গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দকে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জীবনে শুরু হলো এক নতুন অধ্যায়। দীর্ঘ সাধনার ফলে তিনি যে শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন তার প্রকাশের সুযোগ ঘটল পাশ্চাত্যে। স্বামীজীর আহ্বানে ঐ বছর আগস্ট মাসে তিনি ইংল্যান্ডে যাত্রা করেন। স্বামীজীর নির্দেশে লন্ডনে 'খ্রিস্ট থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি'তে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে প্রথম বক্তৃতা দিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। স্বামীজী সঠিক মানুষকে চিনেছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ হয়ে উঠলেন পাশ্চাত্যে সফল হিন্দুধর্মের প্রচারক। ১৮৯৭ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত লন্ডনে ধারাবাহিকভাবে বেদান্তের উপর বক্তৃতা ও ক্লাস নিয়ে বাগ্মিতার পরিচয় রাখেন।

এরপর স্বামীজীর নির্দেশে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৯ আগস্ট স্বামী অভেদানন্দ পৌঁছালেন আমেরিকার নিউইয়র্কে স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত সোসাইটির সম্পাদিকা মিস্ মেরী ফিলিপস্ এর বাড়িতে। এই সময় অপর গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দ ছিলেন আমেরিকার বস্টনে। খবর পেয়ে তিনি নিউইয়র্কে এলেন স্বামী অভেদানন্দের সাথে দেখা করতে। আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বেদান্ত প্রচারে পাশ্চাত্যবাসীদের মুগ্ধ করলেন।

খ্রিস্টান পাদ্রীদের বিরোধিতা ও আক্রমণ প্রতিহত করে একমাত্র ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদে প্রাণ সংশয়ের মতো পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেয়েছেন এবং গুরুদেবের সার্বজনীন ধর্মসমন্বয়ের বাণী প্রচার করেছেন। আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি একজন দার্শনিক রূপে সম্মানিত হন। এখানকার কাজে সাময়িক বিরতি দিয়ে তিনি ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ১৫ মে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যথা ইটালি, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি ভ্রমণ করতে যান। চারমাস পর ফিরে আসেন আমেরিকায়। আমেরিকা ও ইউরোপে স্বামী বিবেকানন্দ যে বেদান্তের বীজ বপন করেছিলেন, তাতে জল সিঞ্চন, পরিচর্যা ও রক্ষা করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এই বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামী অভেদানন্দ। ১৮৯৬ থেকে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ পঁচিশ বছর পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচার করে বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রামকৃষ্ণ মিশনের যে বেদান্ত প্রচার ও আধ্যাত্মিক বিকাশ কেন্দ্র সম্প্রসারিত হয়েছে স্বামীজীর পরে অভিন্ন হৃদয় সন্ন্যাসীভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক রূপে সর্বজন স্বীকৃত। এরপর তিনি ফিরে এলেন ভারতে।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ২০ ফেব্রুয়ারি তিনি কলকাতা ৪৫ বি, মেছুয়া বাজারে ভাড়া বাড়িতে 'শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ' স্থাপন করেন। পরে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে উত্তর কলকাতায় রাজা রামকৃষ্ণ স্ট্রিটে স্থায়ী ঠিকানায় এই মঠ স্থানান্তরিত করেন। বক্তৃতার মাধ্যমে বেদান্ত প্রচার কমিয়ে তিনি রচনা করেন অনেক মূল্যবান গ্রন্থ যথা—স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (১০ খণ্ড), 'আমার জীবন কথা' (২ খণ্ড), 'মরণের পারে', 'ঈশ্বরদর্শনের উপায়', 'প্রাত্যহিক জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ', 'কর্মবিজ্ঞান', 'পুনর্জন্মবাদ', 'যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব', 'যুগে যুগে যাঁদের আগমন' ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশিত কাজ শেষ করে তিনি ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর রামকৃষ্ণলোকে গমন করেন এবং রেখে যান এক মহাজীবনের আদর্শ। আমরা ধন্য ও কৃতার্থ তাঁর নামাঙ্কিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়'-এর সাথে সংযুক্ত থাকতে পেরে।

পুলিশের ঘরে সন্ন্যাসী সত্যব্রত থেকে স্বামী সত্যানন্দদেব

বিজয় কুমার দাস

(প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়)

বীরভূমের সিদ্ধ ফকির বিলায়েত আলীর কাছে একদা হাজির হয়েছিলেন কুমুদনন্দিনী দেবী। কুমুদনন্দিনীর পুত্র মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল কাশীশ্বরীর। কিন্তু বিয়ের পর বেশ কয়েক বছর কেটে গেলেও সন্তান আসেনি কাশীশ্বরীর গর্ভে। আর এজন্যই কুমুদনন্দিনী এসেছিলেন সিদ্ধ ফকিরের কাছে। কিন্তু কী বললেন সিদ্ধ ফকির বিলায়েত আলি। তিনি কুমুদনন্দিনীকে বললেন, ''তোমাকে গভীর রাতে একলা শ্মশান সাধনা করতে হবে।'' কুমুদনন্দিনীর পুত্রবধূকে আশ্বাস দিয়ে তিনি আরো বললেন, ''পরপর কয়েকটি সন্তান তুমি লাভ করবে। কিন্তু তোমার দ্বিতীয় সন্তানটি হবে অদ্বিতীয় মহাপুরুষ।''

কাশীশ্বরী সেই কথা শুনে শ্মশান সাধনা করলেন সন্তান কামনায়। তার সাধনা সার্থক হয়েছিল। প্রথম সন্তান সত্যসাধনের জন্মের দু'বছর পরেই জন্ম হল সত্যব্রতর। এই সত্যব্রতই সেই অদ্বিতীয় মহাপুরুষ। পরবর্তীতে স্বামী সত্যানন্দদেব, যে জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ সাঁইথিয়া শহরে এসে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়'। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম উজ্জ্বল শিষ্য। সেই অভেদানন্দ মহারাজের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে সত্যব্রত হয়েছিলেন স্বামী সত্যানন্দ।

এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। পুলিশের ঘরের ছেলে সত্যব্রত হয়ে গেল সন্ন্যাসী। এই জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসী স্বামী সত্যানন্দের সেবাব্রতর পাশাপাশি গান ও কবিতা রচনায় তাঁর অপরিসীম দক্ষতা উল্লেখযোগ্য। বহু খ্যাতিমান শিল্পী তাঁর লেখা গান গেয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রসিকলাল চন্দ্র ও তাঁর দ্বিতীয় পত্নী নয়নতারা দেবীর সন্তান কালীপ্রসাদ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দীক্ষিত সন্তান হয়ে স্বামী অভেদানন্দ হিসাবে সুপরিচিত হয়েছিলেন। শোনা যায়, মা কালীর প্রসাদে তাঁর জন্ম হয়েছিল বলেই তাঁর নাম রাখা হয়েছিল কালীপ্রসাদ। এই কালীপ্রসাদই পরবর্তীকালের স্বামী অভেদানন্দ। কালীপ্রসাদের জন্ম হয়েছিল ১৭ই আশ্বিন, ১২৭৩ (২রা অক্টোবর, ১৮৬৬)।

সেদিক থেকে বিচার করলে রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য স্বামী অভেদানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দের শিষ্য স্বামী সত্যানন্দদেব।

কলকাতায় বসবাস হলেও সত্যব্রতদের দেশের বাড়ি বীরভূমে। তাই বীরভূমের প্রতি তাঁর একটা টান ছিল ছোটবেলা থেকেই। পরবর্তী সন্ন্যাস জীবনে বীরভূম তাঁর অন্যতম কর্মকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। পুরনো কলকাতার নামকরা হিন্দু স্কুলের ছাত্র সত্যব্রতর বিশেষ আগ্রহ ছিল বিজ্ঞানের প্রতি। স্কুলের পড়া শেষ করে ১৯২০ সালে ভর্তি হলেন বিদ্যাসাগর কলেজে। কলেজে পড়াশুনোর পাশাপাশি জপ, ধ্যান, সাধনায় মনোনিবেশ করেছিল সত্যব্রত। বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে আই. এ., স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৯২৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করা সত্যব্রত নিয়মিত বাড়িতে জপ, ধ্যান করত। কলেজে পড়ার সময়ই সত্যব্রত দীক্ষা নিয়েছিল স্বামী অভেদানন্দের কাছে। বিবেকানন্দের সঙ্গেও সত্যব্রতর খুবই সখ্য ছিল।

সত্যব্রতকে তার পথ থেকে কিছুতেই ফেরানো যায়নি। বাড়ির লোকজনের জোরাজুরি টলাতে পারেনি সত্যব্রতর মন। বিয়ের নানা প্রস্তাব সম্বন্ধ এলেও রাজি হয়নি সত্যব্রত সংসারের পথে পা দিতে। তার পথ সাধনার পথ। লালবাজার থানার ডেপুটি কমিশনার ছিলেন সত্যব্রতর বাবা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। টেগার্ট সাহেব তখন পুলিশ কমিশনার। সেই আমলে তেজস্বী ও সাহসী ডেপুটি কমিশনার মহেন্দ্রনাথ 'জ্যান্ত সিংহ' হিসাবে লোকমুখে পরিচিত ছিলেন। এ হেন মহেন্দ্রনাথও টলাতে পারেননি সত্যব্রতকে সাধন পথ থেকে। সত্যব্রত অভেদানন্দকে জানালেন তার ইচ্ছার কথা। অভেদানন্দ তাকে ব্রহ্মচর্য সন্ন্যাস দিতে রাজি হলেন। কিন্তু যেহেতু সত্যব্রত দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ কমিশনারের ছেলে, তাই

স্বামী অভেদানন্দের ভক্তদল অভেদানন্দকে বোঝালেন, সত্যব্রতকে ব্রহ্মচর্য সন্ন্যাস দিলে পুলিশ আশ্রমই তুলে দিতে পারে। অভেদানন্দও বুঝেছিলেন সত্যব্রতর মধ্যে এক আশ্চর্য শক্তি আছে। সেই শক্তির গুণে সে রামকৃষ্ণের মত ও পথ অনুসারে কাজ করতে পারবে। তাই শেষ পর্যন্ত অভেদানন্দ সত্যব্রতকে ব্রহ্মচর্য সন্ন্যাস না দিয়ে তাঁর কাঁধে অনেক বড় দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার কথা ভাবলেন। স্বামী অভেদানন্দ দার্জিলিং-এ আশ্রম স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার দায়িত্ব সত্যব্রতকে দেওয়ার কথা ভাবলেন। সত্যব্রতর বাবাকে অভেদানন্দ মহারাজ বলতে এলে তারা ছাড়তে চাইলেন না সত্যব্রতকে। তবে কথা দিলেন সত্যব্রতর সাধন পথে তারা বাধা হবেন না। অভেদানন্দ এরপর সত্যব্রতকে গৃহ পরিজনের সঙ্গে থেকেই সাধন পথে থাকার অনুমতি দিলেন। পরবর্তীতে পিতা মহেন্দ্রনাথ সত্যব্রতকে সিউড়ির বাড়িটি দান করেন। সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। মায়ের কাছ থেকে খদ্দরের ধুতি নিয়ে গেরুয়া রং করে সত্যব্রত মা ভবতারিণীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করল। পুলিশ কমিশনারের ছেলে সত্যব্রত 'স্বামী সত্যানন্দ' হয়ে আত্মপ্রকাশ ক'রে সেবাধর্মে জীবন উৎসর্গ করল।

গান ও কবিতা রচনায় সত্যব্রতর এক আশ্চর্য দক্ষতা ছিল। গান ও কবিতা হয়ে উঠল সত্যব্রত তথা সত্যানন্দের সাধনার মাধ্যম। অজস্র গানের রচয়িতা স্বামী সত্যানন্দের প্রতিটি গান যেন ঈশ্বরকে নিবেদিত অর্ঘ্য। এছাড়া রামকৃষ্ণ বন্দনা, বিবেক বন্দনা, অভেদ বন্দনা, সরস্বতী বন্দনা, দেশ বন্দনা ধ্বনিত হয়েছে সত্যানন্দের গানে। গান সম্পর্কে সত্যানন্দের মত এইরকম—সংগীত যেন সন্ধ্যার সুর, ঘরে ফেরার ডাক, সাঁঝের কোলে মায়ের চুমা—যমুনার কূলে অকুলের অভিসার... অশান্ত অসীম সাগরের বুকে যে সংগীত সেও, যে সব হারানোর ডাক। আর সেই ডাকেই তো ছুটে আসে সাত সায়েরের সুরধুনি।

স্বামী সত্যানন্দের লেখা 'জীবন পদ্মে স্পন্দিত হোক রামকৃষ্ণ সারদা নাম... আজও শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা জননীর বন্দনায় এই গান গেয়ে থাকেন ভক্তের দল। বহু খ্যাতিমান শিল্পী সত্যানন্দ রচিত গান গেয়েছেন। সেই সব গান কখনও হয়ে উঠেছে বন্দনাগীতি, কখনও প্রার্থনা, কখনও নিবেদন। শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে বেশ কিছু গান লিখেছেন, যেমন— (১) 'হে রামকৃষ্ণ তোমার স্পর্শে/ ধরণী হয়েছে মুক্তিতীর্থ', (২) 'রামকৃষ্ণ কৃপলে, রামকৃষ্ণ দয়াল, জয় রামকৃষ্ণ দুলারে', (৩) 'তুমি ধরার দুখে এলে ঠাকুর / কত না ছলে / তুমি রাম হয়েছ শ্যাম হয়েছ / আবার রামকৃষ্ণ যে হ'লে' (৪) 'রামকৃষ্ণ নাম জপ অবিরাম', ৫) 'ভজ রামকৃষ্ণ কহ রামকৃষ্ণ লহ রামকৃষ্ণের নাম রে / ঐ নাম নামী দিন যামি / রহে এক ঠাম রে...' ইত্যাদি।

তেমনি জননী সারদা, স্বামী বিবেকানন্দের বন্দনাও আছে তাঁর গানে। সারদা বন্দনার উল্লেখযোগ্য গান হল— (১) 'জননীং সারদাং নমামি বরদাং / নমামি অভয়াং শরণে শুভদাং', (২) 'জয় জয় জননী/জয় সারদে জয় জ্ঞানদে / জয় জ্ঞান বিজ্ঞানদায়িনী', ৩) 'বাংলা মাটির মা যে গো তুই / আমার বাংলা মাটির মা, ওই শ্যামল মেঘের ছায়া দেখি নয়নে জমা', (৪) 'জ্ঞানের জ্ঞানদা দীনের সারদা / শরণাগতের ওগো তুমিই তো মা'।

এছাড়াও স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়েও তিনি বেশ কিছু গান লিখেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—(১) 'হে বীর বিবেকস্বামী / সপ্ত লোকের অলকা হইতে মর্ত্যে এসেছো নামি', ২) 'আলোকের দূত হে প্রভাতী সুর/ হিমাচল শিব স্বামী / শৃন্বন্তু সে গান শোনাও অভিমন্ত্রের বাণী।'

স্বামী সত্যানন্দ দেব দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন স্বামী অভেদানন্দের কাছে। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর বাড়িতেও গিয়েছিলেন। সেই অভেদ স্বামীকে নিয়ে লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য গান হল—১) 'কালির পূত প্রসাদ এনেছো / এনেছো পরমানন্দ / সপ্তলোকের সন্ধান ছাড়ি / এসেছ অভেদানন্দ', (২) 'করুণাগঙ্গা উছসি এসেছো / হরির চরণ চুমি / জীবন পদ্মে বিকশিল তাই / স্বর্গ পরশমণি', ৩) 'কাল ভুলানো কালো মেয়ের ছেলে / কালী নাম তাইতো তুমি গেলে...'।

এইসব গানের পাশাপাশি স্বামী সত্যানন্দদেব বেশ কিছু শ্যামাসঙ্গীতও লিখেছেন। তার দু-একটি

এইরকম—(১) 'কালী বলে কাল কাটাতে / কালের কোলে দিসনে ফেলে / কাল ভুলানো কালো মেয়ের আমরা তবে নই কি ছেলে'।

বলাই বাহুল্য তাঁর লেখা প্রতিটি গান যেন ভক্তির ফুল দিয়ে গাঁথা মালা। আসলে গান ছিল স্বামী সত্যানন্দের কাছে সাধনার অন্যতম মাধ্যম। ভাবতে আশ্চর্য লাগে দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ কমিশনারের ছেলে কিভাবে নিজেকে সাধনার পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। সব বিলাস বৈভব ছেড়ে গৈরিক বসনের সন্ন্যাসী হয়ে উঠেছিলেন। গানের পাশাপাশি কবিতা লেখার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

অন্যদিকে বিজ্ঞান শিক্ষাও ছিল তাঁর প্রিয় শিক্ষা। তাঁর শিষ্যা শ্রী অর্চনাপুরীর লেখা 'সবার ঠাকুর সত্যানন্দ' বইয়ে অর্চনাপুরী লিখেছেন, ঠাকুরের আর এক প্রিয় শিক্ষা ছিল বিজ্ঞান শিক্ষা। নানা রকম যন্ত্র দিয়ে তিনি পরীক্ষা করতেন যন্ত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর ধ্যান-জপের শক্তি অন্য মানুষের মধ্যে দেওয়া যায় কিনা। অনেক সময় তার সুফলও পেয়েছেন। যেমন পড়াশোনায় কারো হয়তো মন বসছে না। ঠাকুর একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র দিয়ে তার মাথায় স্পর্শ করে তীব্র জপ করতে লাগলেন। দেখা গেল সত্যই তার পড়াশোনায় মন বসল এবং ভালোভাবেই পাশ করল।

বীরভূম হয়ে উঠেছিল ঠাকুর সত্যানন্দ দেবের অন্যতম কর্মকেন্দ্র। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে বীরভূমের সিউড়িতে গড়ে উঠেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর যথারীতি ভক্তদের সংখ্যা বাড়ল। বড়দের পাশাপাশি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও সেই আশ্রমে অবাধ যাতায়াত ছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তিনি খুব ভালবাসতেন। তাই একসময় আশ্রমেই ছোটদের জন্য একটি স্কুল খুললেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তিনি সব সময় সুশিক্ষা দিতেন। নীতিকথা শোনাতেন। শিক্ষার প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। সিউড়ির নিকটবর্তী সাঁইথিয়ায় তিনি গুরু অভেদানন্দের স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়। তিনি নিজ হাতে এই মহাবিদ্যালয়ের শিলান্যাস করেছিলেন। তাঁর আদর্শকে সামনে রেখেই সিউড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের পরিচালনায় গড়ে উঠেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ। ১৯৪১ সালে সিউড়ি আশ্রমে শুরু হয়েছিল দুর্গাপুজো। সারদা জননীর জন্মশতবর্ষে সিউড়িতে শুরু হয়েছিল সারদা মেলা। সিউড়ির আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর বীরভূম ও সাঁওতাল পরগনার বেশ কিছু জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বীরভূম, বিহারের পর কলকাতার বরানগরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সত্যানন্দদেব পরবর্তীকালে বরানগরেই থাকতেন বেশি সময়। শিশু সম্মেলন, সুধী সম্মেলন, কবি সম্মেলন ইত্যাদির আয়োজন করা হত। সাধু সম্মেলনেরও আয়োজন করা হত। দেশ-বিদেশের বহু মানুষ সত্যানন্দদেবের কাছে এসেছিলেন। গান, কবিতা রচনায় বিশেষ দক্ষতা ছিল স্বামী সত্যানন্দদেবের। অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসটি তৎকালীন কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী কৃষ্ণানন্দের (ডঃ কেডি রায়) ইচ্ছায় 'সত্যানন্দ ছাত্রাবাস' নামে চিহ্নিত। শিক্ষায়, সাহিত্যে বিজ্ঞানে তার আগ্রহ ও অবদান ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

একদা যিনি পারিবারিক কাঠামো ছেড়ে বেরিয়ে এসে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তিনিই হয়ে উঠেছিলেন সেবা ধর্মে উৎসর্গীকৃত স্বামী সত্যানন্দদেব দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ কমিশনারের ছেলে সত্যব্রত হয়ে উঠেছিলেন সত্যব্রত থেকে সত্যানন্দ। সে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। ত্যাগব্রতে ব্যতিক্রমী সন্ন্যাসী। সেবাব্রতে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন তিনি। তিনি বলেছেন—''জগতের প্রয়োজন কতকগুলি শক্তিমান পবিত্র লোক। কৃমিকীটের মতো সব চলছে। এতে জগৎটা তো থাকতে পারেনা। দেখ না, সব বড় বড় আধার তাড়াতাড়ি চলে যায়। প্রার্থনা করতে হয় যাতে এইসব আধার দীর্ঘদিন থাকে। এরাই তো জগৎটাকে ধরে আছেন।

ঋণ স্বীকার :

১) সবার উপরে সত্যানন্দ—শ্রী অর্চনাপুরী
২) স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা—বাসুদেব সেন
৩) প্রার্থনা গীতি—স্বামী সত্যানন্দ
৪) সত্যানন্দ বাণী—শ্রীরামকৃষ্ণ।

পদক নিয়ে হ্যাপা

জলদবরণ দত্ত
(প্রবেশবর্ষ : ১৯৬৬)

সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের সঙ্গে সেই ছাত্রজীবন থেকে আজও জড়িয়ে আছি। এবার পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে সশরীরে থাকতে পারছি না। তবে সঙ্গে আছি। লেখার অনুরোধে আমার জীবনের একটা ছোট্ট কাহিনি বলছি আজ।

১৯৭২ সালের বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ফাইন্যাল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার জন্য আমি একটি স্বর্ণপদক পাই, যেটি ১৯৭৫ সালের সমাবর্তনে আমাকে দেওয়া হয়। সঙ্গে দেওয়া হয় gold control dept কে দেয় একটি ফর্ম। আমি ঐ ফর্ম ফিল-আপ করে পাঠানোর সাথে সাথে অনেকটা বড় ফরম্যাটসহ একটি চিঠি পাই, যেটা টাইপ ও কয়েকটা কপি করে আমাকে পাঠাতে বলা হয়। তাতে একটি তথ্য চাওয়া হয়—সেই স্বর্ণপদকে সোনার পরিমাণ ও তৎকালীন বাজার দাম। ওটার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়-কে জানালে আমাকে জানানো হয় ওটা জানার প্রয়োজন নেই। সে কথা গোল্ড কন্ট্রোল-কে জানালে তারা আমাকে জানায় ফর্ম যথাযথ ফিল আপ করে পাঠাতে। আমি বাধ্য হয়ে গোল্ড কন্ট্রোল-কে জানাই এ বিষয়ে আর চিঠি-চাপাটি করলে আমি বাধ্য হবে পদকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরত দিতে। বিষয়টির ওখানে সমাপ্তি।

এ প্রসঙ্গে জানাই, অন্য যারা পদক পেয়েছিল তাদেরকে এ ঘটনা জানালে তারা জানায়, তারা কেউ ঐ চিঠি গোল্ড কন্ট্রোল-কে পাঠায়নি।

সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের প্রাক্তন আমি

তাপস সাহা

(প্রবেশবর্ষ : ১৯৯২)

সুখে দুঃখে মেশানো জীবনটাকে শুকনো পাপড়ি বাতাসে বিগলিত করে মনে হল জীবনটাকে দুটি ভাগে ভাগ করা দরকার। প্রথম ভাগেই একখানা অদ্ভুত পত্র রচনা করলে কেমন হয়। শুভস্য শীঘ্রম। যেই ভাবা সেই কাজ। স্বর্ণখচিত স্মৃতিবিজড়িত ফেলে আসা সেই তিনটি বছর ''যেতে নাহি দিব'', তবুও ''যেতে দিতে হয়''।

সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে মায়ামরীচিকায় উপবেশন করে নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে উদযাপন করা যে কি আনন্দের, ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

আমি ফিরে এসেছি বত্রিশ বছর পূর্বে ১৯৯২ সাল।

কৌতূহলবিষ্ট সদ্য যৌবনে উপনীত এক যুবক, নিরতিশয় শঙ্কিত ও উদ্‌ভ্রান্ত একা পেল্লাই টিনের বাক্স নিয়ে উপস্থিত সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে। আগাগোড়া ঘরকুনো ছেলে মায়ের আঁচল ছেড়ে চলে এসেছে নতুন জীবনের মুন্সিয়ানা দেখাতে।

রুম নম্বর নয়। সমস্ত ঘরটা জুড়ে ছোটো ছোটো খান তিনেক কাঠের চৌকি নবাগত ছাএটিকে স্বাগত জানালো।

মেঘে মেঘে বাড়ে বেলা। বন্ধু হয়েছে মেলা। রুম নং ৯ থেকে পরিবর্তিত হয়েছে ৩৪-এ। নিতাইদা, ঘোষালদা, বিশুদা, দিলীপদা, ডালিম ও ট্যাম্পা আর ছাত্রাবাসের কলহাস্যমুখর তরুণ প্রবীণ ছাত্রের দল মিলে মিশে একাকার হয়ে এক সুবিশাল সুখী পরিবার। বাজার করে আনন্দ। আলুর ঘ্যাট সহযোগে অন্ন ভোগে আনন্দ। সিনেমা হলে ছায়াছবি দেখে আনন্দ। ভোর বেলা টিউশন পড়ে ফিরে আসার আনন্দ। প্রভাতে অবসরে বাপিদার চায়ের দোকানে ঘুগনি চপ পাঁউরুটি চাখার আনন্দ। পরিপাটি করে কলেজে যাওয়ার আনন্দ। শেষ বিকেলের ধূলিধূসরিত পায়ে কেউ ভলি, কেউ ক্রিকেট কিংবা ভেতরে টিভি রুমে ক্যারামবোর্ড খেলার আনন্দ। মেঘভরা আকাশের বিদ্যুৎ দীপ্তির মতো গভীর রাতে অডিট শেষ করে শুনশান রাস্তা বেয়ে স্টেশনে প্লাটফর্মে গরমাগরম চা-পানে মহা আনন্দ কখনও কোনদিন ভুলতে পারবো না।

নিবিড় অন্ধকারের বুক চিরে আঠারোর নব যৌবনে ভর করে দুঃসাহসী অভিযান করে বিদ্যার দেবীর মূর্তি ট্রেনে আবাহন করে এসে পরম শান্তিতে আরাধনা করে সে আনন্দের স্বাদ অনুভূতির তরঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যেভাবে অনাবিল সুখের স্বাদ দিয়েছে তার কোনো ভাগ হবে না।

বিস্তর টানা হেঁচড়ার পর দোল খেলার আনন্দ শহর প্রদক্ষিণ করে জামা কাপড় রঙের সমুদ্রে ভাসিয়ে ভূতের বেশে ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে ছাত্রাবাসে ফিরে এসে সাবানের কঠিন শাসনে অসহায় রঙের বিদায় ঘোষণা করে ডাইনিং রুমে উদরপূর্তি পরবর্তী জীবনে মনের খাতায় লিখে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে।

শিশুর মতন আদরের ধন পৌষ মাস অঙ্গীকার করে, হয়েছে সময় পিকনিকে যাবার। হৈ হৈ কাণ্ড রৈ রৈ ব্যাপার। গভীর রাতে জনহীন দিগন্ত বিস্তৃত পথ ধরে কনকনে শীতের কাঁপুনি হেলায় উড়িয়ে দর্পভরে প্রলয়সমুদ্রবাহী উত্তাল কলরোলে ভোরের শিশির ভেজা কুয়াশাঘেরা সাগর সৈকত দীঘায় এসে উপস্থিত হয়ে অচেনার আনন্দে সে কি সুখ বলে বোঝানো দায়। সাগর সৈকতে সমুধুর অতল জলের ভেতর হতে প্রিয় সম্বোধনে সূর্য দেবের উদয় দেখে বলতে ইচ্ছে করেছিল ''আহা কি দেখিলাম জন্ম জন্মান্তরে ভুলিবো না''। প্রাতরাশ শেষ করে আনন্দ আভায় সাগরের সাথে জলকেলি অন্তরের অন্তঃস্থলে লাবণ্যপ্রবাহভরে দীর্ঘতর

মেয়াদী জমা হয়ে থেকে গেল। ঝাউবনের পল্লবপ্রচ্ছায় প্রশান্ত বিশ্বাসে দুপুরের ভুরিভোজ হৃদয়ের কানে কানে মৃদু ভাষে সংগোপনে ভাগ্যদেবতা বলে গেল, নবস্ফূটপুষ্পসম স্বর্গসুখ তুলে দিলাম, লহ তারে দুবাহু বাড়ায়ে। স্বপ্নসম সেই দিনের চমৎকার অনুভূতি বিশ্বাসভরে আজও গচ্ছিত হয়ে আছে মনের মণিকোঠায়। শেষ বিকেলের কাঁপিত আলোক মালায় মুকুলিত হয়ে সুন্দর সাহানা রাগে অনিন্দ্য সুন্দরী সাগর সৈকত দীঘা কে বিদায় জানিয়ে ফিরে চলা ছাত্রাবাসের পথে।

আর হ্যাঁ, প্রত্যেক মাসের শেষের দিন এলাহী খাবার যাকে গ্র্যাণ্ড ফিস্ট নাম দিয়ে ভাত ডাল কষা মাংস দই মিষ্টি পাঁপড় কল্পলোকে গানের পুলকে সন্ধ্যার সুগন্ধ নিশ্বাসে ভক্ষণ—সে কি ভোলা যায়!

কখন যে কিভাবে নিঃশব্দচরণে আঁধারস্রোতে যেতে নাহি মন চায় তবু যেতে হবে ঘনমেঘভারে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। মাতৃহীন বালকের মতো অব্যক্ত বেদনা বুকে নিয়ে ছাত্রাবাসের মায়াডোর ছিন্ন করে কলরবরাশি পিছনে ফেলে বিশ্বপ্রলয় সৃজনে চিরস্মৃতিময় সত্যানন্দ ছাত্রাবাস অন্তরের অন্তঃস্থলে লাবণ্যপ্রবাহভরে রয়ে যায় আমার অন্তরে, সবার অন্তরে।

সময়ের তরঙ্গে ভেসে চলতে চলতে কিছু প্রাক্তন ছাত্রের অদম্য ইচ্ছের উপর ভর করে আকাশকুসুম কল্পনা কোনো এক সোনার কাঠির ছোঁয়ায় পুনরায় মিলিত হবার স্বাদ পাবার সুযোগ করে দিয়েছে।

বছরের কোনো এক দিন ফেলে আসা সেই ছাত্রাবাসের সুখ পারতপক্ষে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে একত্রিত হতে পারলে মন্দ কি। রব উঠেছে চলো গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো করে চিত্তশুদ্ধি করে আসি। দুর্ভাগা বয়সগুলোকে ফুৎকারে উড়িয়ে অন্তত একদিনের জন্য আমরা সবাই রাজা আমাদের এই মিলন মেলাতে। সাধুবাদ জানাই নতুন করে একটা পত্রিকা প্রকাশ করার প্রচেষ্টাকে।

EC-র সংসার

বুবুল সরকার
(প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৫)

জীবনে চলার পথে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়। কখনো একা, কখনো দলগত ভাবে। সাফল্য নির্ভর করে দলগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। সাথীদের সাথে কাজ করতে করতে কখন যে তারা আপন হয়ে যায় বুঝতেও পারা যায় না। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবিচল থাকা একজন পুরুষ মানুষের আদর্শ বৈশিষ্ট্য। একজন মানুষকে চেনা ও জানার চেষ্টা করতে করতে জীবন অতিক্রান্ত হয়ে যায়। আবার বিভিন্ন চোখে বিভিন্ন ব্যক্তির অভিরূপ বিভিন্ন। বিগত এক বছরে সত্যানন্দ ছাত্রাবাস প্রাক্তনীবৃন্দের কার্যকরী কমিটির (EC) কার্যকলাপের সাথে যুক্ত হয়ে যে সংসার করে চলছি, এই লেখা আমার মনের চোখ দিয়ে তাদের দেখার একটা চেষ্টা মাত্র। কাউকে আঘাত করার জন্য এই লেখা নয়। আসুন EC-র প্রত্যেককে একটু চিনে নিই।

প্রথমেই বলব আমাদের পরিবারের মাথার কথা যিনি স্নেহ মায়া মমতায় সবাইকে আগলে রেখেছেন সেই ভূমানন্দ স্যার এর কথা। ডাকনাম বুলিদা। একজন আদর্শ শিক্ষক যেমন বিভিন্ন মেধার ছাত্রছাত্রীদের একসাথে এগিয়ে নিয়ে যান, বুলিদাও তেমনি একজন আদর্শ গৃহকর্তার ভুমিকা পালন করেন EC কমিটিতে। অত্যন্ত বিনয়ী, স্নেহপ্রবণ, শীতল মস্তিস্কের মানুষটি আমাদের কাছে বটবৃক্ষের মতো। ওনার স্নেহের ছায়া থেকে আমরা কেউ বঞ্চিত হইনি এখনো পর্যন্ত। দাদা কে আমার প্রণাম জানাই। 'সাহেব' চলচ্চিত্রের মাধবী দেবীর চরিত্রের সঙ্গে তোমার মিল পাই।

ভূমানন্দ সিনহা
প্রবেশবর্ষ : ১৯৮১
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, কান্দি রাজ উচ্চ বিদ্যালয়।
ঠিকানা : কান্দি কলেজ রোড, পোঃ কান্দি, জেলা-মুর্শিদাবাদ, ফোন : ৯৪৩৪৮৫১৫৮৭

এরপর বলব আমাদের সভাপতি মহাশয় শ্রদ্ধেয় কামাল দার কথা। অত্যন্ত বিনয়ী, কর্মতৎপর, স্পষ্টবক্তা এই মানুষটির কাছে সবসময় সহযোগিতা পেয়েছি। ওনার কাছে প্রতিদিন শেখার চেষ্টা করছি। দাদাকে ফোন করে উত্তর পাইনি, এমন একবারও হয়নি। তুমি অনেকটা হিন্দী ছবি 'রাম লক্ষণ' এর জ্যাকি শ্রফ-এর চরিত্রের মতো।

মহঃ মোস্তফা কামাল
প্রবেশবর্ষ : ১৮৮৩
পেশায় শিক্ষক
ঠিকানা : চাকলামাঠ, রামপুরহাট, বীরভূম।
ফোন : ৮৯২৬৭৬৮৩৮৫

এবার পালা সম্পাদক পলাশ ব্যানার্জীদার। গত বছর রিইউনিয়নে পরিচয় হওয়া মানুষটি কখন যে মনের মণিকোঠায় ঢুকে পড়েছে বুঝতে পারিনি। একজন আদ্যপ্রান্ত মাটির মানুষ যার কারো সম্পর্কে কোনো অভিযোগ নেই। নিজের কর্মব্যস্ততায় জেরবার মানুষটি হয়ত আমাদের কম সময় দেন, কিন্তু আদ্যপ্রান্ত হোস্টেল দরদী। ভালো থেকো দাদা। 'গুরু দক্ষিণা' ছবির রঞ্জিত মল্লিকের চরিত্র তুমি।

পলাশ ব্যানার্জী
প্রবেশবর্ষ : ১৯৮৪
পেশা : LIC অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার
ঠিকানা : বিবেকানন্দ পল্লী, লেবু বাগান, সাঁইথিয়া, বীরভূম, ফোন : ৯৪৩৪৪৩১৭৪৫

এবার যার কথা বলব তিনি আমাদের হেঁসেল-এর প্রধান দ্বার-রক্ষী শোভনদা। মানুষটা অনেকটা নারকেলের মতো—ওপরটা কঠিন, ভেতরটা নরম মনের। মানুষটি নিজের নীতিতে অবিচল, স্পষ্টবক্তা, যুক্তিবাদী। অনেকের কাছেই তিনি অপছন্দের, কিন্তু ভাঁড়ার ঘর আগলে রাখা এই মানুষটি লক্ষ্যে অবিচল। তাঁর স্পষ্ট কথা—আমি অন্যদের কাছে খারাপ হলেও চলবে, কিন্তু ভাঁড়ার ঘরের দ্রব্যাদি লুটপাট হতে দেব না। এমন একজন কঠোর ও নমনীয় মনের মানুষ কখন যে বন্ধু হয়ে গেল বুঝতেই পারিনি। দাদা তোমার নীতি আদর্শ ঠিক আছে বলেই আমরা রিইউনিয়ন ও সারা বছরের কর্মকাণ্ড বছরের পর বছর ধরে টেনে নিয়ে চলেছি। স্যালুট দাদা তোমাকে। শোভনদা 'পথভোলা' ছবির উৎপল দত্ত-র চরিত্র।

শোভন কুমার মুখোপাধ্যায়

প্রবেশবর্ষ : ১৯৮২

পেশা : ঔষধ ব্যবসা (কোয়ালিফায়েড ও রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট, পশ্চিম বঙ্গ ফার্মাসি কাউন্সিলের অধীনে)

ঠিকানা : গ্রাম-বিষয়পুর, পোস্ট-ভালকুটী, থানা-লাভপুর, বীরভূম, ৭৩১২০১

বর্তমান বাস : আমোদপুর ও সিউড়ি

ফোন : ৯৭৩২০৬৪৮৪৪

এবার সুধীদা। শাহরুক খানের সেই বিখ্যাত ছবি 'ম্যায় হুঁ না' -র রাম এর চরিত্র। হোস্টেলের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত আমাকে বিনা ব্যয়ে গ্র্যাজুয়েশন করার সুযোগ করে দেওয়ার মুখ্য চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম হলো সুধীদা। না, সুধীদা আজও বদলায়নি। নরম, দরদী মনের এই মানুষটি আমাদের সমস্যা সমাধানের শেষ রাস্তা। চুটকি মেরে প্রতিবার EC কমিটির সামনে আগত সমস্ত বাধা সরিয়ে দিতে ওস্তাদ সুধীদা। ঠিক যেন 'সহজ পাঠ'-এর চরিত্র 'শম্ভু'-র মতো। জানি দাদা আমৃত্যু তুমি এইরকমই থাকবে।

সুধীরঞ্জন গাঙ্গুলি

প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৩

পেশা : চাকুরী।

ঠিকানা : কালিমোহন পল্লী, বোলপুর, বীরভূম, ৭৩১২০৪

ফোন : ৯৪৭৪৭৬৬৯৫০

মৃদুভাষী, স্নেহপ্রবণ, ভদ্র ও রুচিশীল এই মানুষটি দীর্ঘ দিন ধরে ছাত্রাবাসের প্রাক্তনীদের বিপদে পাশে দাঁড়াতে অভ্যস্ত। 'সুজিতদা, এটা তোমাকে করতে হবে' বললে না বলেনি কখনো। দাদা, তোমার কাছে সহনশীলতার শিক্ষা নিয়ে চলেছি প্রতিনিয়ত। 'ভালোবাসা ভালোবাসা' ছবির তাপস পালের চরিত্রে তুমি মানানসই।

সুজিত কুমার দাস

প্রবেশবর্ষ : ১৯৯২

পেশা : অনির্দিষ্ট

ঠিকানা : সাঁইথিয়া, বীরভূম

ফোন : ৯৮৫১১৪১৬৫৭

এবার পালা শান্ত স্বভাবের ধীর স্থির মানুষটির, যিনি যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসেন। ওনার হৃদয় যেন খাঁটি সোনা। আমার খুব প্রিয় একজন মানুষ। দুর্গাপুর এলাকার যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য আকাশদা নামটাই যথেষ্ট। 'হাম সাথ সাথ হ্যায়' ছবির বড় ছেলে (মনীশ ভেল) এই চরিত্রের সঙ্গে খুব মিল পাই।

আকাশ ভট্টাচার্য

প্রবেশবর্ষ : ১৯৮৭

পেশা : চাকুরী

ঠিকানা : ৫২, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বীথি, SAIL কো. অপ. হাউজিং কমপ্লেক্স, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর -৭১৩২১৬

ফোন : ৯৪৩৪৫৩৬২৪৫

এবার যার কথা বলব তিনি আকাশদারই প্রতিবিম্ব সবার প্রিয় শিবাশিসদা। গতবছর পরিচিত হওয়া মানুষটি আজ আমার খুব প্রিয় একজন। আকাশদা ও শিবাশিষদা কে নন্দী ও ভিরিঙ্গি বলা যেতে পারে। শান্ত স্বভাবের

মানুষটির সাথে হোস্টেলের দাদা ও ভাইদের নিত্য যোগযোগ। যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ সুচিন্তিত মতামত দেন। 'হাম সাথ সাথ হ্যায়' ছবির অলোক দেবনাথের চরিত্র।

শিবাশিস মণ্ডল
প্রবেশবর্ষ : ১৯৮৫
পেশা : ব্যবসা
ঠিকানা : নলহাটী, বীরভূম
ফোন : ৯৮৩২৭৮৮২২৮

ফুটবল খেলায় নম্বর ৯ ও ১০ খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমার লেখাতেও তাই। আমার No. ৯ 'ঝুকেগা নহি ....' সুপার স্মার্ট, অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী সন্দীপদা। মানুষটাকে খুব গভীরভাবে বুঝতে পারিনি এখনও, তবে উনি আমার কাছে PUSHPA ...

সন্দীপ দাস
প্রবেশবর্ষ : ১৯৮৭
পেশা : Superintendent of CGST & Customs
ঠিকানা : গুলমোহর, ৫১৬, হোসেনপুর, কলকাতা -১০৭, ফোন : ৯৪৩৪১৮৮১৫৪

'গল্প হলেও সত্যি' ছায়াছবির মুখ্য চরিত্র প্রবাদপ্রতিম রবি ঘোষের কথা নিশ্চয় সবার মনে আছে। সবাইকে হাসিয়ে, সবার কাজ সঠিক সময়ে করে, সবদিক সামাল দিয়ে একটা অগোছালো পরিবারকে গুছিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাধারী সেই মানুষটি আমাদের সবার প্রিয় সাগরদা। সাগরের তীরে গেলে মন যেমন ভাল হয়, সাগরের ঢেউ যেমন কর্মচঞ্চল অবিরাম গতিতে চলে, এই মানুষটিও তাই। ছোটো বড় সবার সাথে মিশে যাওয়ার অনাবিল ক্ষমতা, কর্মে অগ্রগণ্য, সদাহাস্যময়, প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, দিলখোলা, হোস্টেলপ্রেমী এই মানুষটির নাম সত্যিই সার্থক।

সাগর কুমার দাস
প্রবেশবর্ষ : ১৯৮৪
পেশা : সার্ভিস (পোস্টাল)
ঠিকানা : গ্রাম-পোস্ট : কুণ্ডল, জেলা-মুর্শিদাবাদ, ৭৪২১৬৮
ফোন : ৯৭৩৩৯২৫৮৫৭

এবার যার কথা বলব তার নামটার মধ্যেই যেন ম্যাজিক আছে। মানবেন্দ্র রায়। বড় মানব (মানব যশদা) মনে হচ্ছে ছোটর হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়ে গেছে। অসম্ভব ক্রীড়াপ্রেমি, ছেলেমানুষ, আবেগী, কর্মনিপুণ, মনেপ্রাণে হোস্টেলের সাথে জড়িয়ে থাকা একটি মানুষ, যার এক ডাকে সবাই হোস্টেল ছুটে আসে। ভাই আমার সারাজীবন তুই এরকমই থাকিস। তবে ওর কিছু নেগেটিভ দিক আছে যেটা থেকে ওকে সরে আসতে বলব তা হলো প্রচণ্ড আবেগ। এর জন্য অনেক ক্ষতির সম্মুখীন ও হয়। 'রাম লক্ষণ' ছবির অনিল কাপুরের চরিত্র ওর সাথে মিলে যায়।

মানবেন্দ্র রায়
প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৭
পেশা : নেট ওয়ার্ক মার্কেটিং
ঠিকানা : পাকুয়াহাট, মালদা
ফোন : ৮৯০৬৭০৮৮৯৮

আমার টিমের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়, আড়ালে থেকে কাজ করে, অসম্ভব নেটওয়ার্কিং এবিলিটি, বাস্তববাদী, ঠোঁটকাটা একজন মানুষ অনেকের কাছে অপ্রিয়। মলয় দাস, একটা ত্রাস। 'দামিনী' ছবির সানি দেওল।

মলয় দাস
প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৭
পেশা : স্কুল শিক্ষক
ঠিকানা : গ্রাম-পোস্ট : কুণ্ডল, থানা-বড়ঞা, জেলা-মুর্শিদাবাদ
ফোন : ৯৭৩২৬৪০০৭৪

'শোলা অউর শবনম' ছবির অনুপম খের বা DDLJ ছবির অনুপম খের-কে মনে আছে আপনাদের। সমস্ত ছবিতে কৌতুক অভিনেতার অভিনয় করতে করতে

আসল কাজটা উনিই করে দেন। সদাহাস্যময়, কর্মনিপুণ, কোনো দেখনদারি নেই, সবার অবহেলার পাত্র ATM RAJA। গ্রুপের কম্পিউটার সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ অবলীলায় করে ফেলতে ওস্তাদ ইনি। তাই ভাই, বন্ধুরা নজর উঁচু করুন। সিম্পল দেখতে এই ছেলেটির মধ্যে কি বারুদ আছে, তা আপনারা জানেন না।

আবু তাহের মাসুম রাজা
প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৬
পেশা : শিক্ষক
ঠিকানা : বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
ফোন : ৯৭৩৫৬২৯০৩৬

মূলত নব্বই-এর দশকের শেষের দিক থেকে BBA course রমরমিয়ে চলত কলেজে। তাই হস্টেলে BBA গ্রুপের অনেক আবাসিক ছিল। সেই গ্রুপের এক ভাই হলো পিন্টু মুখার্জী। ওর সাথে খুব বেশি মেশার সুযোগ হয় নি। EC কমিটির কাজ করার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও নিজের কর্মব্যস্ততার জন্য ও খুব একটা সময় করে উঠতে পারেনি।

পিন্টু মুখার্জী
প্রবেশবর্ষ : ২০০১
পেশা : Service
ঠিকানা : ঝিলম অ্যাপার্টমেন্ট, কুমারপুর, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, ৭১৩৩০৪
ফোন : ৬২৯৭২২১৫৭১

EC member দের মধ্যে শুধু জীবা-কে চিনতে পারিনি। sorry জীবা। আগামীতে সুযোগ পেলে তোকে নিয়ে আরো লিখব ভাই।

জীবানন্দ ভট্টাচার্য
প্রবেশবর্ষ : ২০০৫
পেশা : শিক্ষক
ঠিকানা : গ্রাম-ধুলটিকুড়ি, গোপালপুর, থানা-শান্তিনিকেতন, ৭৩১২০৪
ফোন : ৮৯২৭৮০৬৭৫৮

এবার পর পর তিন মহারথীর কথা বলব, যারা ছাড়া রিইউনিয়ন pen and paper-এ সীমাবদ্ধ থাকত। ভাই, তোদের মূল্যায়ণ করার জন্য কোনো ছায়াছবির চরিত্র এখনো পাইনি। তোরা তো কর্মবীর, তাই তোদের নিয়ে লেখাটা আমার ধৃষ্টতা।

সুনীত সাহা, যার মুখে শুধু শোনা যায়, 'হাঁ দাদা' — আদেশ করার অপেক্ষা। তারপরেই সব হাজির, যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ। আমরা যারা বেশিরভাগ সদস্য ঐ কয়েক ঘন্টা মজা করতে আসি—আসলে সুনীত, সুব্রত আর আর রঞ্জিতের ঘাম ঝরানো ফসলের আনন্দ নিই। বয়সে ছোটো হলেও তোদের কর্মকাণ্ড আমাদের কাছে শিক্ষণীয়। অবশ্য সে খবর কে বা রাখে।

সুনীত সাহা
প্রবেশবর্ষ : ২০০১
পেশা : শিক্ষকতা
ঠিকানা : গ্রাম-হেতিয়া, পোস্ট-কুন্ডল, থানা-বড়ঞা, পিন নং-৭৪২১৬৮, মুর্শিদাবাদ
ফোন : ৯৭৩২৫৮৩১৩১

এক নিপাট ভদ্রলোক, কাজের মানুষ, শান্ত স্বভাবের কর্মবীর রঞ্জিত ভাই। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে হোস্টেল সাফাই, মঞ্চ সজ্জা, পত্রিকা তৈরির দায়িত্ব, সারা বছর বিভিন্ন মিটিং—ওর পক্ষেই সম্ভব। এরকমই থাকিস ভাই আমার।

রঞ্জিত কুমার সেন
প্রবেশবর্ষ : ২০০২
পেশা : শিক্ষক
ঠিকানা : সাঁইথিয়া, বীরভূম
ফোন : ৯৮৩২৭৬০৫১১

তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা, ধুরন্ধর analist, ইটের জবাব পাটকেল দিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাধারী, কর্মে নিপুন স্বভাবটাই তাকে অন্য দের থেকে আলাদা করে—সুব্রত সাহা। ভাই আগামী দিনে হোস্টেলের কর্মকাণ্ডের আরো গুরু দায়িত্ব এ তোকে দেখতে চাই।

সুব্রত কুমার সাহা

প্রবেশবর্ষ : ২০০২
পেশা : মাইনিং মেট/ট্যাক্স এডভাইজার
ঠিকানা : বোলপুর, বীরভূম
ফোন : ৭০০১৫৩৩২৩৫

এবার একটু রহস্যময় চরিত্র। নিরামিষভোজী, অসমম্ভব খিচুড়িপ্রেমী, NGO-র কাজে ব্যস্ত এই মহান মানুষটি 'যমালয়ের জীবন্ত মানুষ' ছবির ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়-কে মনে করিয়ে দেয়। নিজের ক্ষমতার পঞ্চাশ শতাংশ কাজ করলে আজ আমাদের দল অনেক উপকৃত হতে পারত—গিরিধারী দাস। আশা করি ভবিষ্যতে করবে।

গিরিধারী দাস
প্রবেশবর্ষ : ২০০০
পেশা : ট্যাক্স কনসালটেন্ট (ইনকাম ট্যাক্স GST) ও ইন্সুরেন্স এডভাইসার (জেনারেল, লাইফ ও হেলথ ইন্সুরেন্স)
ঠিকানা : তাঁতিপাড়া, বীরভূম
ফোন : ৯৪৩৪৪৯২১৭৪

রিইউনিয়নের এর মূল কারিগরের সম্পর্কে বেশি কিছু বলব না। শুধু বলব 'কোনি' ছায়াছবির ক্ষীরদা চরিত্র বা 'হীরক রাজার দেশে' ছবির উদয়ন পণ্ডিতের চরিত্র যারা এখনো দেখেননি একটু দেখে নিন, পলাশ সিনহা-কে বুঝতে সুবিধা হবে। নিন্দুকেরা বলেন এনার শত্রু সংখ্যা বন্ধুর থেকে বেশি।

পলাশ সিনহা
প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৪
পেশা : Scientist
ঠিকানা : পুনে, মহারাষ্ট্র
ফোন : ৮২৪৯০৩৮৮৬২

যাই হোক, এবার লেখা শেষ করার পালা। আমার এই লেখার উদ্দেশ্য EC কমিটির গুণগান করা নয়, বরঞ্চ এরা পরবর্তী কালে কমিটিতে থাকুক বা না থাকুক, এরা প্রত্যেক আবাসিকদের কঠিন সময়ে পাশে থাকার জন্য প্রস্তুত। প্রত্যেকের ফোন নম্বর ও ঠিকানা দেওয়া আছে। প্রয়োজনে যে কেউ যোগযোগ করতে পারেন।

হাতের পাঁচটা আঙ্গুল যেমন সমান নয়, আমাদের কমিটি সদস্যরা ঠিক তেমন। কত ঘাত প্রতিঘাত, মান অভিমান, তর্ক বিতর্ক, রাগারাগি নিয়ে চলে EC কমিটির সংসার। কিন্তু ছাত্রাবাসের আবাসিক হিসাবে কেউ বিপদে পড়লে এরা সবাই মুষ্টিবদ্ধ হয়ে লড়াই করার জন্য এগিয়ে আসে।

কিন্তু একটা আক্ষেপ রয়ে গেল। বিগত দুই বছরে আমার ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতা খুব একটা ভাল নয় ছাত্রাবাস পরিবার নিয়ে। রিইউনিয়নের registration, fees ইত্যাদি নিয়ে প্রত্যেকের সাথে যোগাযোগ করেও অনেকের কাছে সাড়া পাওয়া যায় না। হয়ত অনেকে আমাদের ভাবেন আমরা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর কাজ করি বা রিইউনিয়ন অনুষ্ঠান থেকে অনেক আর্থিক সুবিধা পাই। ভুল ধারণা থেকে বেরিয়ে আসুন। বছরে সবাইকে একবার একসাথে দেখার ইচ্ছায় আমরা গাধার মতো পরিশ্রম করি।

শুধু আবাসিক হিসাবে গ্রুপে নীরব দর্শকের ভূমিকায় যারা থাকেন, তাদের কাছে অনুরোধ আপনারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসুন। কারণ, তালি বাজাতে গেলে দুটো হাত লাগে।

সর্বশেষে, EC-র সদস্য নয় এমন তিন জন মানুষের সাথে যোগযোগ রাখুন, কথা দিচ্ছি জীবন সম্পর্কে আপনার ধারণা বদলে যাবে।

অনিমেষ মণ্ডল ৯৭৩৪০৭৩৪৫৪, কুণালকান্তি সিংহরায় ৭৩৮৪২৩১১২৫ ও সুরজিত রায় ৯৪৭৫৭৩৯৮০৬।

করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে

কমলেশ ঘোষ
(প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৫)

১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ সোমবার। 'YESTERDAY ONCE MORE' 'ভাঙা মেলা' বলে একটা কথা শুনেছিলাম ছোটবেলায়। সেটা ছিল আসল মেলার পরের দিন। আজ আমাদের যেন সেই দিন।

কাল সারাদিন এক স্বর্গভূমিতে কাটিয়ে ফিরে আসা। আহা, কি এক আনন্দে, স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে দিয়ে, কোথা দিয়ে, কিভাবে যে কেটে গেল চব্বিশটি ঘন্টা!

তীর্থভূমির আঙিনা সম্ভবত ছাড়িয়ে গিয়েছিল স্বর্গভূমি'র সৌন্দর্য-সুষমাকেও। হয়ে উঠেছিল এক মায়াময় মরুদ্যান অথবা অমরাবতী!

প্রায় শ'খানেক হৃদয়, এক তানে, এক সুরে, এক সাথে নেচে উঠেছিল! সম্ভবত সেটাই ছিল ঐকতানের সুর! অথবা ইংরেজি তে একেই কি বলে হারমোনিকা!

সবার বুকেই একটাই সুর বেজে চলেছে—''পুরনো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়। ও সেই চোখে দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়।" দিনটি ছিল স্মৃতির অতলে ডুব দেওয়ার অপেক্ষা।

গতকালের সন্ধ্যে থেকেই সেই অপেক্ষার সুর 'স্মৃতির হাত ধরে, এই শতাধিক তরুণ ও বৃদ্ধের' প্রাণগুলো উথলে উঠছিল—ফিরে যেতে চাইছিল সেই সুদূর অতীতে—সেই পাওয়া আর না পাওয়া হিসেবের বেড়া জালের ওপারে! যেখানে 'কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল'।

এবার অলিখিত আবেগকে পিছনে ফেলে, আবার এগিয়ে চলার হাতছানি।

রবি বাবুর গানের সুরে—

''ভরা থাক স্মৃতি সুধায় জীবনের পাত্র খানি,
মিলনের উৎসবে তায় ফিরায়ে দিয়ো আনি"

গেয়ে আবার এগিয়ে চলা ও অপেক্ষার পালা!

আমার প্রিয় সত্যানন্দ ছাত্রাবাস

অনিরুদ্ধ বিশ্বাস

(প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৬)

অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয় আমার উচ্চ শিক্ষার প্রথম সোপান আর সত্যানন্দ ছাত্রাবাস আমার গহন চেতনায় এক দীপ্ত অনুরণন, আমার এক আকাশ অহংকার, বহির্জগৎ চেনার আঁতুরঘর। আজকে ছেচল্লিশ বছর বয়সে যখন পেছনে ফিরে তাকাই তখন অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয় এর ইংরাজি সাম্মানিকের তৃতীয় ব্যাচের ছাত্র এবং সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের আবাসিক জীবনের অসংখ্য সোনালী স্মৃতি মানসপটে চির ভাস্বর হয়ে ওঠে ও ফল্গুনদীর মতো মনের মধ্যে অনাবিল ভালোলাগার অন্তসলীলা হয়ে বইতে থাকে।

এই ছাত্রাবাসের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়েছি। অগ্রজপ্রতিম স্নেহশীল দাদাদের কাছে পেয়েছি শিক্ষার চেতনামুখী উত্তরণের পথে এগিয়ে যাবার দুরন্ত সাহস আর মহতী ভাবনার রক্তিম অনুভূতি। ইয়ারমেট বন্ধুদের অকৃত্রিম আন্তরিক ভালবাসা ও ভাইদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আমার সারা জীবন চলার পথের পাথেয়। এই ছাত্রাবাস আমাকে শিখিয়েছে অনুশাসন, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, ত্যাগ ও আত্মসংযম। হোস্টেলের প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে ওঠার পরে এক অদ্ভুত আনন্দ ঘন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে কিভাবে যে দিনগুলো অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছিল নিজেও বুঝতে পারছিলাম না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত সংখ্যক মেধাবী দাদা, বন্ধু ও ভাই পাওয়া সত্যি বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমরা ছিলাম চিঠির যুগের ছাত্র। মুঠোফোন ছিল না কিন্তু ভীষণ আন্তরিকতা ছিল আর ছিল পারস্পরিক অটুট বন্ধন। স্মৃতির সরণী বেয়ে হাঁটলে মনে হয় এই তো দল বেঁধে বাপিদার দোকান টিফিন খেতে যাওয়া, হোস্টেল মাঠে ক্রিকেট খেলা, বিকেলে ময়ূরাক্ষী পাড়ে ঘুরতে যাওয়া, শান্তিহাউসে সিনেমা দেখা, দীঘা মঙ্গপুতে পিকনিক করা, যেন সেদিনের ঘটনা। হোস্টেলের সরস্বতী পুজো আজও আমাকে স্মৃতিমেদুর করে তোলে। সেদিন আমরা সবাই হিরো, কারণ ছাত্রীরা ওই একদিন আমাদের হোস্টেল চত্বরে প্রতিমা দেখতে আসত। মণ্ডপ সাজানো, দেওয়াল পত্রিকা বের করা এবং বক্স বাজিয়ে বিসর্জন—সে এক অফুরন্ত আনন্দ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অন্যন্য নজির। দোলের সময় নাচতে নাচতে স্যারদের বাড়িতে প্রণাম করে ফিস্টের জন্য পয়সা চাওয়া ও রাতে মহাভোজ। আহা! কী আনন্দই না হতো। বাজার করা, মেস চালানোর মতো কঠিন দায়িত্ব অনেক পরিণত করে তুলেছিল। আর মেস ম্যানেজারি শেষ করে অডিট পেশ যেন কেন্দ্রীয় বাজেটের থেকেও বেশি ঘটনাবহুল ও রোমাঞ্চকর। নিজের ও অন্যদের অসুস্থতায় দেখেছি দাদা, বন্ধু ও ভাইদের কী উৎকণ্ঠা ও বিনিদ্র জাগরণ। আবার কেউ নিমন্ত্রণ করলে আনন্দে চোখ মুখ চকচক করত। আমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল কিচেনের নিতাইদা, মেইন গেটের উল্টো দিকের ঘরে থাকতেন।

আর বাকি কিচেন স্টাফ বিশুদা, ঘোষালদা, টেম্পাদা, কালী সকলে আমাদের ঘরের মানুষ হয়ে গিয়েছিল। রাত জেগে আড্ডা, ক্যান্টিলিভারে ঠেক মারা, গান, গল্প, তর্ক, মান-অভিমান আরও কত শত সুখ দুঃখের স্মৃতি মনের মণিকোঠায় হীরা মানিক হয়ে জ্বলজ্বল করছে। কত রকম জোকস, চটুল আলোচনার পাশাপাশি সৃজনশীল আলোচনাও আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। আরও অসংখ্য সুখস্মৃতি আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে হৃদমাঝারে। যে সকল কিশোর ও সদ্য তরুণ ছেলেরা বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে সত্যানন্দ ছাত্রবাসে বর্ণময় সময় কাটিয়েছে আজকে তারা কেউ বৃদ্ধ, বয়স্ক, মধ্য বয়স্ক, পরিণত যুবক। কিন্তু স্মৃতির সরণী ধরে হেঁটে আমরা সবাই

চিরনবীন, চিরতরুণ। আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন মনে প্রাণে এক অদৃশ্য সুতোর বন্ধনে গাঁথা থাকব—এই হোক আমাদের অঙ্গীকার। ব্যাথাতুর চিত্তে স্মরণ করি মানব যশদা, পান্নাদা, সন্তোষদা-সহ অকাল প্রয়াত দাদাদের। সর্বশেষে বলি এই ছাত্রাবাস আমার না বলা বাণীর নীরব ভাষার এক প্রজ্জ্বল প্রকাশ, আমার লক্ষ্য—পথের পূর্ণতার দিশারী। এই ছাত্রাবাসের নামে হৃদ মাঝারে শত পুষ্প বিকশিত হয়ে ওঠে। সকল প্রাক্তন ও বর্তমান আবাসিক সুস্থ সুন্দর থাকুক ও আমাদের ছাত্রাবাসের পুনর্মিলন উৎসব প্রতি বছর সাফল্যমণ্ডিত হোক কায়মনোবাক্যে পরম করুনাময়ীর কাছে এই প্রার্থনা।

সত্যানন্দ ছাত্রাবাস, স্বপ্ন ও বাস্তবের মেলবন্ধন

সোমপ্রকাশ মুখার্জী
(প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৮)

সুদীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে আমি পর্যটনে বেরিয়েছি। গৃহবিলাসী হতে পারিনি অনেক দিন। হোস্টেল, মেসে, আত্মীয়-অনাত্মীয় বাড়িতে পড়াশোনায় যাপন করেছি প্রায় পনেরো বছর। অনেক তীর্থ দর্শন শেষে বুঝেছি—ফেলে আসা জীবনের ডিগ্রি ও মাস্টার ডিগ্রি কোর্সের পাঁচ ছয় বছরটাই সেরা সময়। ১৯৯৮-এ সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে প্রবেশের পর মানুষ হওয়ার যথার্থ পাঠটা আমি সেখান থেকেই পেয়েছি।

ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে সত্যান্বেষী, অভিজ্ঞলব্ধ পথের উন্মোচন, উন্মীলন ও উদ্দীপন সম্ভব হয়েছে। সব কিছু আঁকাড়া মাটি থেকেই সৃষ্ট। কখনও হৃদয়ের বিক্রম, আত্মবিশ্বাসী মন, অগ্রপথিক দাদাদের স্নেহ মিশ্রিত শাসন, কর্তব্যরত খাদ্য সেবকদের অভিভাবক সুলভ আচরণ আর সবার সঙ্গে বসে পংক্তি ভোজনের দিনগুলি রাতগুলি মননে সদা জাগরুক।

উদ্‌যাপনের এই দিনগুলি কখনও ভোলার নয়। আজও ঘুমে জাগরণে, আলস্যে বিলাসে, আবেশের প্রশ্রয়ে জেগে উঠি, ভেসে উঠি, অনির্দেশ্য, অজানা এক আকর্ষণে। চোখ মেলে দেখি স্মৃতির পাতায় লেখা আছে বিচিত্র এক জগৎ। নিস্তেজ পলকের চকিত ঘুমে আচ্ছন্ন হই। ঘুম থেকেই মন গুনগুন করে ওঠে। 'আধেক ঘুমে শয়ন চুমে স্বপন দিয়ে যায়, শ্রান্ত ভালে যুথীর মালে পরশে মৃদু বায়।'

বর্তমান পেশাগত ব্যস্ততার মাঝেও সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের গ্রুপ দেখে মনটা ভালো হয়ে ওঠে। আমি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সময়টাকে একটু বিশ্লেষণ করতে চাই। ছাত্রাবাসের ভিতরে বৃক্ষ, তাতে নানা পাখির বাস, বাইরে সবুজ ঘাসে আবৃত মাঠ, পল্লীপ্রকৃতির নিবিড় হাতছানি, অনতি দূরে ময়ূরাক্ষী নদীর সৌন্দর্য, বিশেষত কাশবনের ঘন ঝোপ—সবকিছুই মন কেমন করে ওঠে। কর্মজীবনে আমি পাহাড় নদী অরণ্যের সহাবস্থান, সারি সারি চা বাগানের সৌন্দর্য প্রাণভরে উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছি। প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। বর্তমানে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে...আমাকে বাইরে যেতে হয়। সুদূর মহারাষ্ট্রের মুম্বাই শহরে যাওয়ার সময় ছত্রিশগড় ও মহারাষ্ট্রের পথে প্রান্তরে প্রকৃতির নানা বৈচিত্র দেখে মুগ্ধ হয়ে উঠি। অসুখের যন্ত্রণা ও পথের ক্লান্তি তখন সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয়ে যাই প্রকৃতির অবগাহনে ডুব দিয়ে। শেষ কথায় বলি, জীবন গড়ার কারিগর আমাদের সত্যানন্দ ছাত্রাবাস। প্রাক্তন দাদা-ভাইরা যেভাবে ছাত্রাবাসের জন্য সবকাজে সদা তৎপর থাকে / থাকেন তা অসাধারণ—তাঁদের সাধুবাদ জানাই। এই ভাবে মানুষের মতো মানুষ হওয়া, ধৈর্য সহনশীলতা, আত্মবিশ্বাস, পরোপকার তা শিক্ষণীয়। এই সমস্ত মণিমুক্তো প্রতিনিয়ত আমাদের স্মৃতির কোঠায় জমা হচ্ছে, যা স্বপ্নসম্ভাবনায় পরিপূর্ণ।

ভাল্লাগেনা

গিরিধারী দাস

(প্রবেশবর্ষ : ২০০০)

রাকেশদা আমার দু' বছরের সিনিয়ার। খেলা পাগল, গম্ভীর, রাকেশদা বললে অন্যদের শুধু শুনতে হবে; মাঝে কথা বলা যাবে না। আমি খেলা থেকে সহস্র যোজন দূরে, সবসময় হ্যা-হ্যা-হি-হি- আর অফুরন্ত আড্ডা। তা এই সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের আমাকে রাকেশদা খুব স্নেহ করত। গান গাওয়া ছাড়া অন্য কোন আবদার হলে না করত না। গৌরচন্দ্রিকা অনেক হল, এবার মূল প্রসঙ্গে আসি।

তখন একটা নিয়ম ছিল, যদি কেউ সারা মাসে চল্লিশটা পর্যন্ত; মানে মাসে কুড়ি দিন মেসে খাবার খায় তবে অর্ধেক মিল চার্জ লাগত। কোন ভাবে একচল্লিশ হলেই ফুল চার্জ। কোন মাসে বাড়ি যাওয়া বা টিউশনের জন্য হোস্টেলে মিল অফ বেশি হলে হিসাব করা শুরু হয়ে যেত আর কতগুলো অফ করলে মিল চল্লিশটার মধ্যেই থাকবে। রাকেশদাকে বললাম, তোমার এ মাসে এমনিতেই অনেকগুলো অফ আছে, আমার তো এমাসে অনেক কাঙ্গালি ভোজের (প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, সাঁইথিয়ার যে কোন প্রান্তে খিচুড়ি ভোগের আয়োজন থাকলেই কোন না কোন সূত্র থেকে আমার কাছে নিমন্ত্রণ আসত বা খবর আসত এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হোস্টেলের সবাইকে যেতে বলত) নেমন্তন্ন থাকেই; তুমি আমার সঙ্গে এরকম দু-তিনটেতে গেলেই তোমার হাফ চার্জ কেউ আটকাতে পারবে না—কড়কড়ে ২৫০ টাকা প্রফিট। আর কি চাই? তবে হ্যাঁ, আমাকে একটা সর-টোস্ট লাগবে। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর রাকেশ দা অবশেষে রাজি। আমিও একটু চোখ, কান খোলা রাখতে থাকলাম, যাতে কোনো প্রোগ্রাম মিস না হয়।

পরদিন সকাল বেলা বাপিদার দোকানে টিফিন করছি, কলেজ পাড়ার জয়ন্ত আমাকে খুব আগ্রহসহ ওদের পাড়ায় কালী পুজো দেখতে যেতে বলল। আমি হাল্কা করে জিজ্ঞাসা করলাম, প্রসাদের ব্যবস্থা? আমার কথা শুনতে পেল কি না বুঝতে পারলাম না। জয়ন্ত বলল, তোমারা সবাই এসো কিন্তু। নিশ্চই যাবো, মনে মনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললাম। দুপুরের খাবার খেয়ে রাকেশদা সহ আমরা আরো কয়েকজন রাত্রে মিল অফ করে দিলাম। রাকেশদা শুধুই আমাকে বিরক্ত করছে, হ্যাঁ রে ভাই তুই ঠিক শুনেছিস তো? আজকে রাত্রে? খিচুড়ির ব্যবস্থা আছে তো? আমি অবশ্য ঠাণ্ডা মাথায় আশ্বস্ত করে অভয়বাণী দিয়েই চলেছি ''কোনো চিন্তা নেই দাদা, আমি আছি অপারেশন সাকসেসফুল হবেই।''

সন্ধ্যায় টিফিন না করে সেদিন সবাই চা, বিস্কুট। বাপী দা (টিফিন স্টল) তো রেগে লাল। যাই হোক, রাত ন'টা নাগাদ আমরা প্রায় সাত-আট জন বেরিয়ে পড়লাম। যেতে যেতে রাকেশদার সেই এক কথা। ভাল্লাগেনা। পুজো মণ্ডপ চত্বরে জয়ন্তকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। খিচুড়ি রান্নার গন্ধ পাচ্ছি না। আমার মন এবার কু গাইছে। কপালে দুঃখ আছে মনে হচ্ছে। অন্যদের আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেবো, এই রাকেশদা-কে কেন যে দলে নিলাম মনে মনে সেই ভাবছি। ওই তো জয়ন্ত! ''আরে তোমরা কখন এলে? খুব ভাল করেছো। প্রসাদ না নিয়ে যাবে না কিন্তু। দাঁড়াও, আমি দেখছি'' বলে জয়ন্ত কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। প্রায় আধঘণ্টা অতিক্রান্ত, কেউ আমাকে গাল দিচ্ছে, কেউ পরামর্শ-উপদেশ আবার কেউ বলছে হোস্টেলে ফিরে যাই চল, যদি কিছু বেঁচে থাকে। আমি অসহায়, মা আমাকে রক্ষা করো মা গো। ওই তো জয়ন্ত ও আরও কয়েকজন মিলে একটা বড় ডেক আনছে। আহাঃ গরম ধোঁয়া ওঠা খিচুড়ি। অবশেষে মা তাহলে এই অভাগার দিকে মুখ তুলে চেয়েছে। কিন্তু এটা কি! মাত্র এক ঠোঙ্গা! পাত পেড়ে পাবো না?

দূর ছাই! এভাবে কি বাঁচা যায় !!! ভাল্লাগেনা...

অমৃত মেঘের বারি

কৌশিক ভট্টাচার্য
(প্রবেশবর্ষ : ২০০৪)

'অমৃত মেঘের বারি
মুখের কথায় কি মেলে
চাতক স্বভাব না হলে'
—লালন ফকির

সত্যানন্দ ছাত্রাবাস আমার অমৃত মেঘ, তার বারি বর্ষণের আকাঙ্ক্ষায় আমার চিরকাল চাতক স্বভাব। এই ছাত্রাবাসের জল, হাওয়া, বাতাসের প্রত্যেকটা অক্ষরের কাছে আমি ঋণী, আমি ঋণী প্রত্যেকটা ভাঙাগড়া, চোরাস্রোত আর খরস্রোতা প্রবাহের কাছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল কেন ঋণী আমি এই ছাত্রাবাসের কাছে? আমরা যখন ফিরে যেতে চাই আমাদের উৎসের কাছে আমরা উপেক্ষা করি আমাদের গতিপথ, উপেক্ষা করি আমাদের প্রপাত, পতন, চোরাবালি আর বদলে যাওয়া বাঁকগুলিকে। আমরা সতত উদযাপনের অহংকারগুলোয় আলো ফেলি কিন্তু আমার কাছে আমার হস্টেল শিরোধার্য তার আকস্মিক কিন্তু অবশ্যম্ভাবী চাবুকের জন্য।

'যখন থাকে অচেতনে
এ চিত্ত আমার
আঘাত সে যে পরশ তব
সেই তো পুরস্কার'

আঘাতের নাম করে যে পুরস্কারগুলো আমি বারবার সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের কাছে পেয়েছি তার জন্য আমি

'নতজানু হয়ে ছিলাম তখনও
এখনও যেমন আছি'

এই আঘাত আমার লিকলিকে সরীসৃপের মতো চলনকে প্রচণ্ডরকম মেরুদণ্ডী হতে সাহায্য করেছে, পাঁকের মধ্যে পাঁকাল মাছের জীবনের হদিস দিয়েছে।

অনার্স পরীক্ষার দিন ছিল সেদিন। ৩২ নম্বর রুমের জানালা থেকে আমি সূর্যস্নাত গ্রাউন্ডের অন্ধকারে তাকিয়ে আছি, দেখছি প্রভাতবেলায় বন্ধু আদিত্য তার কক্ষপথ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আগের দিন পরীক্ষা ছিল ওর, প্রস্তুতির প্রায় পরিপূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও প্রত্যাশার ধারেকাছেও যেতে না পারার ব্যর্থতা নিয়ে ও জন্মদাত্রী জননীর কাছে যাচ্ছে, সত্যানন্দের ক্রোড়ে আমরা তাকে আশ্রয় দিতে ব্যর্থ হচ্ছি, ব্যর্থ হচ্ছি নিজের ভিতর থেকে উৎসারিত আগ্নেয়গিরি লুকিয়ে ওর চাতকশরীরে অমৃত মেঘের বারি বর্ষণ করতে। ডানা ভাঙা পাখির চিত্র ভেসে আসছে, মনে পড়ছে ঝরে যাওয়া গান—

'তুমি আলোর কাছেই যেও
আমি না হয় মিথ্যে হলাম'

আমি ওকে জানালা থেকে ডাকলাম—'কোথায় যাচ্ছিস?' ও ঘুরে তাকাল, ওর উপরের দিকে তাকানো চোখে খাদের অতল আঁধার,

কোনোরকমে বলল—
'বাড়ি'
'কবে ফিরবি'
'দেখি'

পরীক্ষা দিতে যাব আমি তখন, কিন্তু আমার সারা শরীর তখন অবশ হয়ে আসছে, রুদ্ধ হয়ে আসছে যেন শ্বাস। যে অদ্ভুত আঁধার সেদিন আমি ওর চোখে দেখেছিলাম তা ভুলে যাওয়া অসম্ভব, বিসর্জনের যে গাঢ় ব্যথা ওর বুকের মাঝে তখন বাজছিল তাতে আমার খুব ভয় করছিল, ভয়—

'ও আর ফিরবে তো?'

কিন্তু বন্ধু আমার ফিরে এসেছিল নচিকেতা হয়ে, আলো হয়ে, ঝর্ণার স্বচ্ছলতা হয়ে, যার জলে পুষ্ট হয়ে

আমরাও জীবনের তরে পুনরায় হয়ে উঠেছিলাম বিকাশমুখী।

তিনবার এস এস সি দিয়ে তিনবারই সফল হয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিল ফিরে আসা যায়, এভাবেও ফিরে আসা যায়। বর্তমানে বন্ধু পদার্থবিদ্যার পাঠদানের সাথে সাথে জীবন বিদ্যারও পাঠদান করে চলছে তার বিদ্যালয়ের ছোট্ট ছোট্ট কুঁড়িদের। আর এই অধমকেও তার প্রচণ্ড অন্ধকার এক সময়ে বাড়িয়ে দিয়েছে আস্থার অমোঘ আচ্ছাদন।

এবার বলা যাক বাহালুলদার কথা। আমাদের হস্টেলের পত্রিকায় বন্ধুদের নিয়ে লেখা একটা প্রচেষ্টায় আমার একটা লাইন ছিল—

কবর ফুঁড়ে উঠে আসি
আমি বাহালুলের মনন।

ক্রিকেট বাহালুলদা'র প্রিয় খেলা আর সেখানে সে একজন ফাইটিং অলরাউন্ডার। সত্যিই একজন প্রকৃত অলরাউন্ডারের মতোই জীবনের ক্রিজে জমে যাওয়া ব্যাটারকে দাদা আমার কখনও ক্লিন বোল্ড করে ফিরে এসেছে আবার কখনও বা বাপি বাড়ি যা'র ঢঙে বিপক্ষের ঝোড়ো গতির বাউন্সারকে পাঠিয়ে দিয়েছে সীমানার বাইরে। অনার্সের রেজাল্ট বেরিয়েছে ঘন্টা দুয়েক হল, সন্ধে নেমে এসেছে ছাত্রাবাসের আঙিনায়, BBA বিল্ডিংয়ের চত্বরটাতে যেন অন্ধকার আরও গাঢ়, আলোও যেন প্রবেশ করতে ভয় পাচ্ছে, পিন ড্রপ সাইলেন্স ৪ নম্বর ঘরের ভিতর, শোনা যায় না এমন একটা ঝড় যেন ক্রমাগত আছড়ে আছড়ে পড়ছে, তোলপাড় ঢেউ উঠছে ডুবিয়ে দেওয়ার হুমকি সমেত।

'বাহালুল দা', —আমি ডাকলাম। কোনো আওয়াজ নেই। চরাচরে কী অসীম নিঃসঙ্গতা!

'বাহালুল দা', —আবারও ডাকলাম। 'বুল কৌশিক'—এবার উত্তর এল।

'চলো, টিফিন করতে যাব'।

'তুই যা, যাবনা আমি'

'এসো গো, সবাই দাঁড়িয়ে আছে'

উত্তর আসছেনা, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে আছি তখনও, মনে মনে ভাবছি পাঁচ মিনিট পর আবার ডাকব, ঠিক তখনই অচেনা একটা গানের স্বর শোনা যাচ্ছে ভিতরে, গাইছে আজিমদা আর বাহালুলদা, যদিও তার বাণী শুনতে পাচ্ছি না। তারপরই বেরিয়ে এল ওরা, আমরা গ্রাউন্ড পেরিয়ে গেলাম, পেরিয়ে গেলাম কলেজ গেট। সামনে পিচ রাস্তা, রাস্তায় নিয়ন আলো। আমরা কি রাস্তাটা পেরোতে পারব? পেরোতে কি পারবে বাহালুলদা?

কবর ফুঁড়ে কিন্তু সত্যিই উঠে এসেছে বাহালুলদা। আগুনের নদী হয়ে বয়ে গেছে সরোবরের দিকে যার আঁচে শীতকাল সেরে যায় আমাদেরও। বসন্ত আসে, স্বপ্ন দেখি ফুল সুন্দর হওয়ার।

কিন্তু প্রিয় সুবীর?

'সব পাখি ঘরে ফেরে, সব নদী'

কিন্তু বন্ধু আমার ঘরে ফিরল না। আজ আমাদের সবার গতিপথ মিলনোৎসবকে কেন্দ্র করে সত্যানন্দের মোহনায় এসে নত হয়, শুধু বন্ধুর গতিপথ কীভাবে যে চোরাবালিতে ফুরিয়ে গেল!

আমার লেখাটিতে সুবীরকে নিয়ে একটা লাইন ছিল—

রণভূমে আমি সুবীর, আলোর দিশারী

আমার জলে ভেজা মুড়ির মতো জীবনে সে সত্যিই আলো হয়ে ছিল, আনন্দ হয়ে ছিল আমার খেলায়। এই তো সেদিনের কথা, হাত বাড়ালেই যেন স্পর্শ পাই—

বৃষ্টির রাতে আমার মুঠোফোনে বন্ধুর নাম, সেই নাম হাসনুহানার গন্ধ আনছে, সে আমাকে বলছে—

'অপু পড়ছিলাম, তোর কথা মনে পড়ল'

আহা বিভূতিভূষণ!

আহা অপরাজিত!

তুমি আমার আর বন্ধুর মাঝে এভাবে ব্যথার বাঁশি হয়ে বেজে যাবে চিরকাল!

এখনও চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাই আমার কোমর ভাঙা অক্ষরগুলোকে কীভাবে ও দাঁড় করানোর চেষ্টা করত সমাজের হাটে, আমার বারবার আপত্তি সত্ত্বেও বারবার ও সবার সামনে বলে উঠতো—

'আমার কৌশিকের কবিতাও ভালো লাগে'।

বুঝতে পারি আমার জড়তার পাহাড়ের হাতুড়ি ছিল

ও, ছিল আমার অক্ষমতায় ঢাল হয়ে।

'অমলকান্তি' প্রিয় কবিতা ছিল আমাদের সে সময়, কাল হো না হো প্রিয় সিনেমা। অমলকান্তি রোদ্দুর হতে না পেরেও ছাপাখানায় কাজ করে গেছে, কাল হো না হো-র আমন মৃত্যুশয্যা থেকেও জীবনবীণা বাজিয়ে গেছে অথচ ফিনিক্সের মতো অজস্র মৃত্যুকে পার করে এসেও কেন তোর আর নবজন্ম হলো না রে প্রিয়?

'কত কথা বলা হলনা প্রিয়
কত সূর্যমুখীর মন ভার'

এখনো তোর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে, জানতে ইচ্ছে করে কেমন আছিস রে ওপারে, ওখানে গিয়ে মিস করছিস না আমাদের প্রথম সবকিছু? মিস করছিস না কি আমাদের বাপিদার দোকানের আদর্শ টিফিন, সাঁইথিয়া স্টেশনের প্রিয় চায়ের ভাঁড়, আকাশভরা তারার নীচে দিনবদলের গল্প, জোছনার আদরে আহ্লাদিত অলৌকিক ময়ূরাক্ষী, চিলড বিয়ার বা কাউন্টার করা সিগারেট? আমরা কিন্তু এখনো করি বন্ধু, এখনো...

বন্ধু আমার মন ভালো নেই, তোমার কি মন ভালো
বন্ধু তুমি একটু হেসো, একটু কথা বলো

এখনো মনে মনে তোকে কত চিঠি যে লিখি, কতবার যে বলি...

'বন্ধু আমার বুকের মাঝে বিসর্জনের ব্যথা
বন্ধু তুমি অমন করে যেয়ো না আর একা'

একা একা চলে গেছে বন্ধু অপূর্ব, বন্ধু নিয়াজুলও। মাঝে মাঝে ভাবি আমাদের ইয়ারটা কি সত্যিই অভিশপ্ত? বিসর্জনের ব্যথা আমাদের কি বয়ে যেতে হবে এখনও? বয়ে কি যেতে হবে চিরকাল?

এই যে আমার বন্ধুদের কথা বললাম, দাদাদের কথা বললাম তারা সবাই বা আমি নিজে অথবা আমরা আসলে সবাই এক একটা নদী, আর তার মোহনা এই সত্যানন্দ ছাত্রাবাস। এই মোহনায় এসে আমি প্রবাহ দেখেছি, বাঁকবদল দেখেছি, আবার দেখেছি চোরাবালিতে আটকে যাওয়াও। বিবিধের মাঝে মহা মিলনের আস্তানা আমাদের এই যে ছাত্রাবাস সেখানে আমরা সবাই নিজের জীবন নিয়ে 'Go as you like' খেলেছি। সেই খেলার ময়দানে ডেলিভার করা প্রত্যেকটা বল আজও আমার জীবনে গতি, শব্দ ও আলো প্রদান করে। তার প্রত্যেকটা অবশ্যম্ভাবী উত্থান ও অনাকাঙ্ক্ষিত প্রপাতের অভিঘাতে আমার আকাশে রামধনু ওঠে রোজ। এই ছাত্রাবাসের মতো এত পরাক্রমশালী শিক্ষক, এত পাগল-প্রেমিক আমি আমার জীবনে আর কাউকে পাইনি। যে বৃহত্তর আয়না আয়োজনের ব্যয় এই ছাত্রাবাস যেভাবে আমাদের জন্য বহন করে গেছে তাতে আমার মতো ক্ষুদ্রতর প্রতিকৃতিও আজ বুঝতে পারে মানব জীবনের অমোঘ সেই বাণী—

''ক্ষুদ্র আমি, তুচ্ছ নই, জানি আমি ভাবী বনস্পতি
বৃষ্টির মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি''।

তাই আজ আর আক্ষেপ নেই জীবনে, আজ জীবনদেবতাকে ধার করে হাসতে হাসতে বলতে পারি—

'যাওয়ার দিনে
এই কথাটি বলে যেন যাই
যা দেখেছি, যা পেয়েছি
তুলনা তার নাই।'

এক হৃদয়বান সন্ন্যাসী আর এক মগ্নচৈতন্যের কবি...

অনিমেষ মণ্ডল

(প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৩)

বাঙালির ইতিহাসে এ বড় গৌরবের অধ্যায় যে প্রায় সমসাময়িক কালে কলকাতার বুকে দুই বিশ্বজয়ী প্রতিভা বিরাজ করেছেন। জন্মের ব্যবধান মাত্র দেড় বছরের। কিন্তু একজন স্বল্পায়ু, অপরজন দীর্ঘায়ু। জোড়াসাঁকো, অর সিমলাপাড়া কতই বা দূরত্ব! তাই তাদের কর্মক্ষেত্রের প্রসারতা ভিন্ন হলেও কোথাও একটা যোগসূত্র আমরা খুঁজে পাই যেখানে মানবতাবাদ সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে অবস্থান করে। মানবপ্রেম আর প্রকৃতিপ্রেম, স্বদেশপ্রেম আর বিশ্বপ্রেম মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

ব্যক্তিগত সম্পর্ক তেমন নিবিড় না হলেও তাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ছিল গভীর। একবার জাপানি পণ্ডিত কাউন্ট ওয়াকুরা রবীন্দ্রনাথকে বলেন 'আমি ভারতবর্ষকে জানতে চাই।' রবীন্দ্রনাথ তাঁকে তৎক্ষণাৎ উত্তর করেন—'If you want to know India-Study Vivekananda' পরদিনই তিনি বেলুড়মঠে গিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করেন। সব শুনে স্বামীজী হেসে বলেন—'না কাউন্ট, টেগোর ঠিক কথা বলেননি। এখানে বৈরাগ্য, এখানে সন্ন্যাস। আপনি বরং রবীন্দ্রনাথের কাছেই ফিরে যান। তিনি জীবন আর সৌন্দর্য্যের পূজারী। এই হচ্ছে তাদের সম্পর্কের একটি দিক।

সমসাময়িক এই দুই বিরাট ব্যক্তি তাদের ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যতাবোধে উজ্জ্বল থেকেও কর্মে, মননে, চিন্তায়, ভাবনায় ছিলেন খুবই ঘনিষ্ঠ। সন্ন্যাসী হলেও স্বামীজীর মধ্যে ছিল কবিসত্ত্বা আর কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল সাধকসত্ত্বা। বিবেকানন্দ নিজে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন। রবীন্দ্রনাথের ভাইপো দ্বিজেন্দ্রনাথের বড় ছেলে দীপেন্দ্রনাথ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি মাঝে মাঝে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িও যেতেন। যাতায়াতের ফলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হন। দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম নরেন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করে। ব্রাহ্মসমাজের বহু অনুষ্ঠানে নরেন্দ্রনাথ গান গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দিতেন। আমরা পরবর্তীকালে দেখেছি রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের দিনে তিনি বলরাম বসুর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে রবীন্দ্রনাথের—'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' গানটি শোনান। দেখা যায় সেই যুগে অনেক গানের আসরে রবীন্দ্রনাথ অর্গান আর নরেন্দ্রনাথ পাখোয়াজ বাজাতেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই মনের দিক থেকে আলাদা হতে থাকেন, যার ফলে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দূরত্ব বাড়তে থাকে। নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী', 'মানসী', 'চিত্রা', 'কল্পনা' প্রভৃতি বইগুলি পড়লেও কোন মন্তব্য করেননি। তেমনি দেখা যায় রবীন্দ্রনাথও বিবেকানন্দের জগৎজয়ী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সেই সময়ে নীরব ছিলেন।

১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মসভা থেকে ফিরে এলে শোভাবাজার রাজবাটীতে এক সংবর্ধনা সভায় তাঁদের দেখা হয়। নিবেদিতার এক চিঠি থেকে দেখা যায় ১৮৯৯-এ ভবানীপুরে আবার তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। কবির বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসু ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলে তাদের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবেকানন্দের যোগাযোগ থাকাটা আশ্চর্যের নয়। ১৯০২ সালে বিবেকানন্দের দেহরক্ষার পর ভবানীপুরে যে শোকসভা হয় সেখানে সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সভায় তিনি বিবেকানন্দকে শাশ্বত ভারতের চিরস্মরণীয় মহাপুরুষ বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক দীর্ঘ ভাষণ দেন। এরপর যতদিন গেছে রবীন্দ্রনাথ স্বামীজীর গুরুত্ব, মহত্ত্ব ও ব্যাপ্তিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। বিবেকানন্দের বাণী সম্পর্কে তিনি

লিখেছেন—''আধুনিক কালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন—সেটি কোন আচরণগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি। দরিদ্রদের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এ কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে।'' স্বামী অশোকানন্দকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—''বিবেকানন্দ স্বার্থবোধের সীমানার বাইরে আর আত্মবোধের সীমার বাইরে মানুষের আত্মবোধকে অসীম মুক্তির পথ দেখান।''

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বলতেন তিনি গুরু নন, তেমনি বিবেকানন্দ বলেছিলেন তিনি তাত্ত্বিক বা দার্শনিক নন। তিনি মনে করতেন ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো বা দর্শনশাস্ত্র শেখানো মানে তাকে অপমান করা। তিনি পূজা করতে চেয়েছেন দরিদ্র নরনারায়ণের। দরিদ্র, নিপীড়িত, অপমানিত, পরাধীন ভারতবাসীর বেদনার সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে তিনি কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন মুক্তির মহামন্ত্র—Arise, Awake, Stop not till the Goal is reached.

রবীন্দ্রনাথ সেখানে কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর বিবেকবাণী—

'শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মান ভার
মানুষের নারায়ণ তবুও কর না নমস্কার।'

বিবেকানন্দ এক জায়গা বলেছেন 'ঐ যারা চাষাভুষা, তাঁতি, জোলা, ভারতের নগন্য মনুষ্য-বিজাতি-বিজিত, স্বজাতি-নিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রম ফলও তারা পাচ্ছে না।''

বিবেকানন্দের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

''বড় দুঃখ, বড় ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার।
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বড় অন্ধকার...।''

বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থ ও রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতা যেন একই কথার গদ্য ও পদ্যরূপ।

তত্ত্বকথা প্রসঙ্গেও বিবেকানন্দ বলেছেন তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা...পশ্চাতে চাহিও না...এগিয়ে যাও, সম্মুখে সম্মুখে।

রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—

''চাব না পশ্চাতে মোরা। মানিব না বন্ধন ক্রন্দন। হেরিব না দিক,
গনিব না দিনক্ষণ করিব না বিতর্ক বিচার-উদ্দাম পথিক'

দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্যে কৃষির উন্নয়ন তথা পল্লী বাংলার উন্নয়ন যে অপরিহার্য একথা দুজনেই একসুরে বলে গেছেন।

শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে দুজনেই বলেছেন শিক্ষার পরিবেশ হবে আনন্দময়, মুক্ত। স্বামীজির বক্তব্য—''The only service to be done for our lower classes is to given them education.''

রবীন্দ্রনাথও বলেন দেশকে মুক্তি দিতে গেলে দেশকে শিক্ষিত করতে হবে। এভাবেই আমরা দেখেছি দুজনের চিন্তাধারার মধ্যে আশ্চর্য মিল। তাই কবি ও সন্ন্যাসী যেন একাকার হয়ে আছেন তাদের মননে, চিন্তনে। তবু রবীন্দ্রনাথ কবির কবি। জগতের আনন্দমঞ্চে তার সবার আগে নিমন্ত্রণ। আর বিবেকানন্দ ধীর স্থির যোগীবর, তপস্যার আসনে তিনি চির অচঞ্চল, সনাতন ভারতের ঘনীভূত রূপ। দেশপ্রেম আর মানবপ্রেম তাদের বেঁধে রেখেছে একসূত্রে। তাই একজন সন্ন্যাসী হয়েও পালিয়ে যাননি গুহাকন্দরে। জনতার হাহাকারের মাঝে স্বল্পায়ু জীবনভর করে গেছেন সেবা আর একজন লেখক কবি হয়েও জনতাকে ছাড়িয়ে বহুদূরে নির্জনে শিলাইদহে বোটের মধ্যে ভারতাত্মার প্রতিচ্ছবি দেখেছেন আর নীরবে অশ্রুপাত করেছেন। তাই প্রাচীন ভারতের গৌরব প্রচারে দুজনেই মুক্ত কণ্ঠ। পাশ্চাত্যের ভাবধারা গ্রহণে দুজনেই উদারমনস্ক। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেছেন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম আর বিবেকানন্দ বেলুড়মঠ আশ্রম। দুজনে আলাদা জগতের মানুষ হলেও চিন্তায় আর কর্মধারায় অজস্র মিল। এর মূল উৎস দুজনেই সারা জীবনভর মানুষের জয়গান গেয়েছেন। একজনের ঈশ্বরপ্রেম আর একজনের মানবপ্রেম মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আর এই দুটিই আমাদের জীবনকে করেছে মহিমান্বিত।

রিইউনিয়ন : দুই বন্ধুর কাহিনি

কুণালকান্তি সিংহরায়
(প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৪)

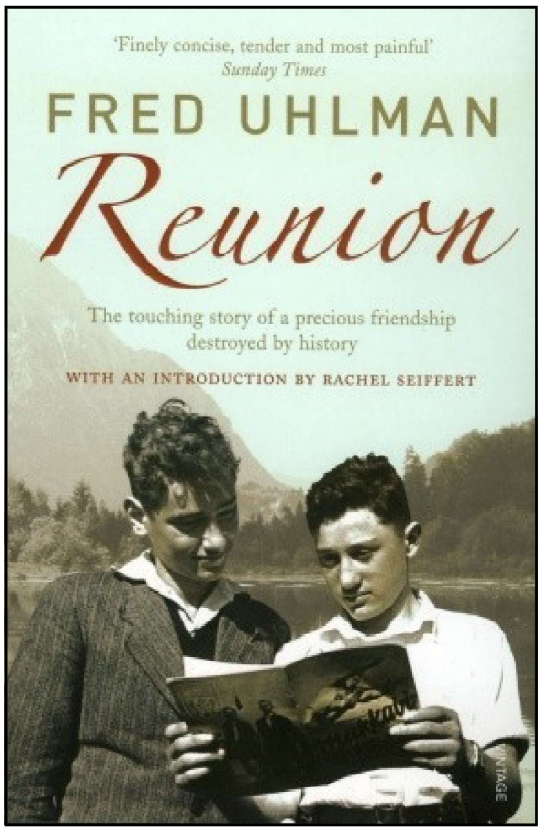

রি-ইউনিয়ন বইয়ের প্রচ্ছদ

আজ থেকে প্রায় ৯০ বছর আগের কথা। দুই কিশোরের নিবিড় বন্ধুত্বকে উপজীব্য করে রচিত একটি অনবদ্য উপন্যাস হলো 'রিইউনিয়ান', বাংলা ভাষায় যার অর্থ হল পুনর্মিলন। লেখক ফ্রেড উইলমান্ (১৯০১—১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন একজন বিখ্যাত জার্মান চিত্রকর। ১৯৭১ সালে ইংরেজিতে উপন্যাসটি লন্ডনে প্রথম প্রকাশিত হবার পরে বিশ্বের বহু ভাষায় বইটি অনুদিত হয়। বাংলায় সাবলীল অনুবাদ করেছেন শিশিরকুমার মজুমদার।

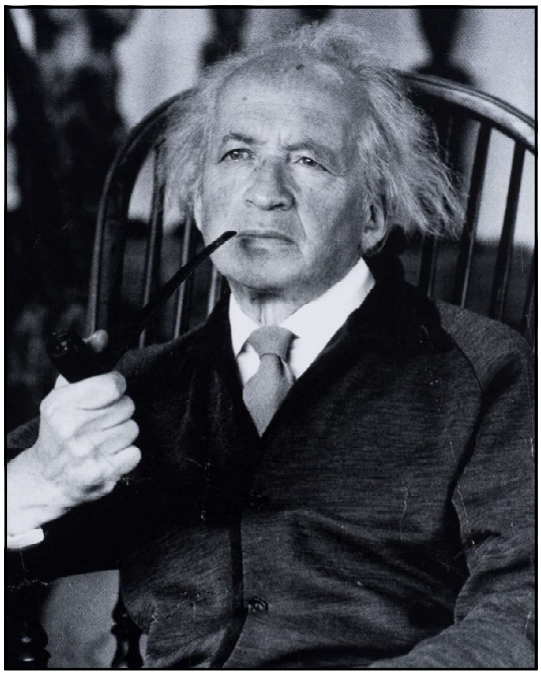

লেখক ফ্রেড উইলমান্

আসুন, এবার উপন্যাসের মূল কাহিনিতে প্রবেশ করা যাক। সময়টা ছিল ১৯৩২ সাল। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫ খ্রিঃ) শুরু হবার সাত বছর আগেকার ঘটনা। সেদিনের পটভূমি ছিল জার্মানির স্টুটগার্ট নামে একটি শান্ত ও সুন্দর শহর। উপন্যাসের প্রধান চরিত্রদ্বয় হল ১৬ বছরের দুটি কিশোর—হ্যান্স ও কোনরাডিন। প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল তাদের। হ্যান্স ছিল এক ইহুদি ডাক্তারের ছেলে। অন্যদিকে কোনরাডিন ছিল জার্মানির এক ধনী ও অভিজাত পরিবারের সন্তান। তার বংশ পরিচয় ছিল তখন রীতিমতো গৌরবের। তবে তারা দুজনেই স্টুটগার্টের ঐতিহ্যময় কার্ল অ্যালেক্সাণ্ডার জিমনাসিয়াম স্কুলের ছাত্র ছিল।

ছুটির পরে দুই বন্ধুই একসাথে বাড়ি ফিরতো। শনি-রবি দুদিনই তাদের স্কুল ছুটি থাকতো। তাই শনিবার এলেই দুজনেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ত অচিনপুরের দিকে। কখনো জঙ্গল ঘেরা কুটিরে, পাহাড়ি ঝর্ণাধারায়, ব্ল্যাক ফরেস্ট পর্বতের কাছে অথবা রাইন নদীর উপত্যকায় —সীমান্তের অপরূপা প্রকৃতির আকর্ষণে তারা দুজনেই ছুটে যেত। কোনরাডিন প্রায়ই হ্যান্সের সাদামাটা বাড়িতে যেত। হ্যান্সের মা-বাবাও তাকে খুবই স্নেহ করত। বিশেষত হ্যান্সের মায়ের হাতের রান্না ছিল কোনরাডিনের খুব প্রিয়। কিন্তু কোনরাডিনের অট্টালিকা সম হাভেলীতে হ্যান্সের আমন্ত্রণ ছিল খুবই কম। সাধারণত যেদিন কোনরাডিনের বাবা-মা বাড়িতে থাকতো না সেদিন কোনরাডিন তাকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতো। বিষয়টা আবেগপ্রবণ হ্যান্সের মনে খুব দাগ কাটে। একদিন সে জানতে পারে যে, কোনরাডিনের মা ও বাবা ইহুদিদের তীব্র ঘৃণা করে। তাই কোনরাডিনের ইচ্ছে থাকলেও প্রিয় বন্ধু হ্যান্সকে তার বাবা ও মায়ের সঙ্গে পরিচিত করতে চায় না। এমনকি সেও ফুয়েরারের (হিটলারের) আদর্শের প্রবল অনুগামী। সেদিন হ্যান্স মনে চরম আঘাত পেয়েছিল।

ইতিমধ্যে জার্মানির ভাগ্যাকাশে হিটলারের আবির্ভাব ঘটেছিল। হিটলারের নাৎসিদল জার্মানিতে বসবাসকারী ইহুদিদের উপর শুরু করলো ভয়ংকর অত্যাচার, যা ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসাবে স্বীকৃত। হ্যান্স লক্ষ্য করল যে, চারপাশটা যেন খুব দ্রুত ও অদ্ভূতভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। কাছের মানুষগুলো কেমন যেন অচেনা হয়ে যাচ্ছে। একদিন স্কুলে একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটলো। স্কুলের সহপাঠীরা তাকে ইহুদি হবার 'অপরাধে' অপমান করে। এমনকি ইতিহাসের শিক্ষক মহাশয়ও তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন। সেদিন তার প্রিয়বন্ধু কোনরাডিনকে সে পাশে পায়নি; বরং বিদ্রুপকারীদেরই সে নীরবে সমর্থন করেছিল। অভিমানে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। তীব্র ক্ষোভ ও একরাশ যন্ত্রণা নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল হ্যান্স।

পরের ঘটনাগুলি ছিল অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। সব কিছু শুনে হ্যান্সের বাবা তাকে আমেরিকায় প্রেরণ করে তার কাকার কাছে। এদিকে জার্মানিতে তখন চলছে 'হলোকাস্ট' অর্থাৎ নাৎসিদের নেতৃত্বে ইহুদি নিধন যজ্ঞ। প্রায় ৬০ লক্ষ ইহুদিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। হ্যান্সের পরিবারেও ঘটলো ভয়াবহ মর্মান্তিক ঘটনা। অপমান ও মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার জন্য তার বাবা ও মা আত্মহত্যা করে।

তারপর কেটে গিয়েছে ৩০টি বসন্ত। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫ খ্রিস্টাব্দ) শেষ হয়ে গিয়েছে অনেক আগেই। শেষ পর্যন্ত হিটলার আত্মহত্যা করেছিল এবং মুসোলিনিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের পতন হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে এই মহাযুদ্ধে মৃত্যু হয়েছে ছয় কোটি মানুষের। জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরের উপর পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করে শহর দুটিকে পুরোপুরি ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে বিশ্ব-রাজনীতিতে শুরু হয়েছে দ্বিমেরুকরণের নতুন রাজনীতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে আরম্ভ হয়েছে ঠাণ্ডা লড়াই।

আজ হ্যান্স আমেরিকার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী। চারিদিকে তার নাম-যশ। একসময় সে ভারি সুন্দর কবিতা লিখতো। কিন্তু কাকার কড়া শাসনে কবি হবার মনোবাসনা একেবারে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। এখন সে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। অঢেল সম্পত্তির মালিক সে। গাড়ি-বাড়ি সবই আছে তার। তবে সে কৃপণ নয়। দুহাতে দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে অকাতরে অর্থ সাহায্য করে।

এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল। প্রায় তিরিশ বছর পরে জার্মানি থেকে একটা চিঠি এসেছে হ্যান্সের কাছে। কিছুটা অবাক হল সে। তার কৈশোরের স্কুল কার্ল অ্যালেক্সাণ্ডার জিমনাসিয়াম স্কুল থেকে একটি আবেদন এবং তার সঙ্গে এসেছে একটি নামের তালিকা। স্কুল কর্তৃপক্ষ তার কাছে অর্থ সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেছে। কারণ ঐ অর্থ দিয়ে তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত ছাত্রদের স্মরণে একটি স্মৃতিস্তম্ভ গড়বেন।

হ্যান্স প্রথমে ভেবেছিল নামের তালিকার কাগজটাকে ছিঁড়ে দেবে। কারণ সেদিন বন্ধুদের ইহুদি বিদ্বেষের অপমান সে তখনও ভুলতে পারেনি। এমনকি

কোনোভাবেই ক্ষমা করতে পারেনি কোনরাডিনকে। বন্ধুত্বের পরিবর্তে তার প্রতি সঞ্চারিত হয়েছিল তীব্র ঘৃণা। কিন্তু এতদ সত্ত্বেও সে নামের তালিকাটিকে ছিঁড়তে পারল না। ওদের স্কুলের মোট চারশো জন ছাত্র নিহত হয়েছে। তালিকায় সকলের পরিচয় রয়েছে।

এবার ওদের ক্লাসের সহপাঠীদের নামের তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করলো হ্যান্স। দেখলো যে, হিটলারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ওদের ক্লাসের ৪৬ জন ছাত্রের মধ্যে ২৬ জন প্রাণ দিয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার তো! ৪৬ জনের মধ্যে মাত্র ২৬ জন! তারপর একটি নাম বাদে বাকি ২৫টা নাম সে দেখলো। তবুও মনটা তার বিদ্রোহ করলো। শেষ পর্যন্ত দেখলো কোনরাডিনের নাম। দেখে আশ্চর্য হল। সেই কোনরাডিন!!

হ্যাঁ কোনরাডিন। তালিকায় লেখা রয়েছে—হিটলারকে হত্যার ষড়যন্ত্রে ধরা পড়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। একি? যে কোনরাডিন হিটলারের আদর্শকে রীতিমতো গর্ব করতো, তাকে ফুয়েরার হিসাবে শ্রদ্ধা করতো, সে কিনা শেষ পর্যন্ত হিটলারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো? তাহলে হিটলারের প্রকৃত স্বরূপটা কি ধরতে পেরেছিল কোনরাডিন? মনটা শান্ত হলো তার। বুকের উপর থেকে দীর্ঘদিনের ভারী পাথর নেমে গেল। বন্ধু কোনরাডিনের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ক্ষোভ সবকিছুই নিমেষে উধাও হল। অজান্তে অশ্রু নেমে এল দু'গাল বেয়ে। প্রিয় বন্ধুর মধুর স্মৃতি তিরিশ বছর পরে হ্যান্স আবার ফিরে পেল তার মনের মধ্যে।

এটাই যথার্থ পুনর্মিলন।

মগজাস্ত্রের মন money

সুব্রত কুমার সাহা
(প্রবেশবর্ষ : ২০০২)

বর্তমান পৃথিবীর মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ভালোবাসাবিহীন অসুস্থ প্রতিযোগিতা... যে কোন ভাবে এগিয়ে যাওয়াটাই যেন সাফল্য .... আত্মসম্মান থাকল না বিসর্জিত হলো এটা নিয়ে আজকাল কেউ আর ভাবিত বলে মনে হয় না... নিজের ইগো, অহংকার বজায় থাকলেই... যেন বিশ্বজয়ী... আজকাল সমাজ তো অনেকাংশেই সোশ্যাল সাইট নির্ভর... তাই What's app– Facebook সহ সমস্ত ডিজিট্যাল যোগাযোগ মাধ্যমগুলো দেখলেই দেখতে পাবেন মানুষ কতটা Ego-নির্ভর, ছোট ছোট বিষয় নিয়ে গ্রুপে গ্রুপে কত অসহিষ্ণুতা একজনের কথাকে চেপে দিতে পারলেই কত্তো সাফল্য!!! যেন ইয়া বড় পদাধিকারী প্রতিপন্ন হয়ে গেল।

সে যাই হোক, কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল সে বিষয়ে আমি যাচ্ছি না। পরিত্রাণের উপায় সম্বন্ধে আলোকপাত আমার শোভা পায় না। কিন্তু মানুষ হিসেবে এসব নিয়ে যখন ভাবি তখন আমার মনে আরো গভীর গভীর প্রশ্নের উদ্রেক ঘটে। এগুলো তো সবই মানুষের ভেতরেই ঘটে। প্রশ্ন টা হচ্ছে... কোথায় ঘটে....?? এগুলো কি মনের বিষয়...?? না কি এই বিষয়গুলো আমাদের মস্তিস্ক পরিচালনা করে...???

আমার মনে হয়েছে, এটার উত্তর খুঁজতে গেলে প্রথমেই খুঁজতে হবে কোনটাকে আমরা মস্তিষ্ক বলি...?? আর আমাদের শরীরে মনের অবস্থানই বা ঠিক কোন জায়গায়...???

অনেক ভেবে... ইন্টারনেট ঘেঁটে যেটুকু উদ্ধার করতে পেরেছি.... আবেগপ্রবণ চিন্তাভাবনাকে আমরা মন বলি আর আবেগ ছাড়া, হিসেবী চিন্তাভাবনাকে আমরা মস্তিষ্ক বলি...

সেই দিক থেকে দেখতে গেলে মন আলাদা কিছুই নয়... মস্তিষ্কের ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল বিক্রিয়ার রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয় মন। আবার মানসিকতা ব্রেইন কে প্রভাবিত করে।

এটা যদি সঠিক হয় তাহলে মন এবং মস্তিষ্ক কি একখ? এই সিদ্ধান্তে কি আসা সম্ভব...? বা মন কি মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রাধীন এটা কি বলা যেতে পারে???

সেটাও বলা সম্ভব নয়, কারণ সেক্ষেত্রে Psychology আর Neurology আলাদা সাবজেক্ট হত না.... আবার এটাও বলা যাবে না যে কারো ব্রেইন কাজ করছে না, তার মানে তার মন নেই...আবার Brain fog, Depersonalization-Derealization Disorder এটা কি মস্তিষ্কের রোগ না মনের রোগ, কি বলব? অথবা Alzhaimer's Disease মস্তিষ্ককে না মনকে... কাকে, কিভাবে affect করে?

তাহলে আপনারাই বলুন মন-মস্তিস্ক আলাদা না এক?? আমাদের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক আচরণগুলো কিসের দ্বারা পরিচালিত?

অহংকার, আত্মসম্মানবোধ, ভালোবাসা এগুলো মূলত কি... এগুলো কি মনের মধ্যে ঘটে চলে নাকি ব্রেইন এর কোন বিশেষ অংশ এর জন্য দায়ী....?

সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে দেখা যাবে অহংকার এবং আত্মসম্মানবোধ মূলত ব্যক্তির নিজের মূল্যায়ন, যা সামাজিক পরিচয়ের সাথে সম্পর্কিত। আমাকে নিয়ে আমার ভাবনাটাই এত কিছুর মূলে। অহংকার, আত্মসম্মানবোধ একটা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অনুভূতিমূলক পরিস্থিতি। মন এবং মানসিকতাই এটার জন্য বেশি কাজ করে। ব্রেইন সরাসরি এর জন্য দায়ী হতে পারে না... তবে হ্যাঁ, প্রোগ্রাম সেট

করে দিলে ব্রেইন সেই অনুযায়ী ফাংশন করবে কিনা সেটা জানার আগ্রহ অবশ্যই আমার আছে।

আবার এই অহংকার এবং আত্মসম্মানবোধ আপেক্ষিক। কেউ তৈলমর্দন করেই গর্বিত তো কেউ আবার আত্মসম্মানের নামে নিঃস্ব। এগুলো আমরা মূলতঃ করে থাকি নিজের আর্থসামাজিক পরিচিতিকে তুলে ধরতে... যদিও সেটা আবার সমাজের অন্যান্য কারোর চিন্তাভাবনার উপর নির্ভরশীল... কারণ কে আত্মসম্মানী, কে অভিমানী.... কারো অহংকার থাকল না ধুলোয় মিশে গেল.... সেটা সমাজের অন্য একজন বা কয়েকজনের ভাবনাচিন্তার দ্বারা সমাজের অন্যান্যদের কাছে প্রচারিত হতে থাকে। তাই এই বিষয়গুলো সাধারণত আপেক্ষিক। এটা কখনই কনস্ট্যান্ট হওয়া সম্ভব নয়। কারণ আপনার আমার মানসিক গঠন সম্পূর্ণ এক হতে পারে না। এটা ম্যান-টু-ম্যান ভ্যারি করে।

অহংকার সাধারণত আত্মকেন্দ্রিকতা এবং অন্যদের চেয়ে নিজেকে উচ্চ মনে করার প্রবণতা। এটি প্রায়ই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস বা শ্রীবৃদ্ধির অনুভূতির সাথে সম্পর্কিত।

আত্মসম্মানবোধ হল ব্যক্তির নিজের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মানের অনুভূতি। এটি আত্মমূল্যায়ন এবং নিজের গুরুত্বের প্রতি সচেতনতা প্রকাশ করে। আবার আত্মসম্মানবোধ তো প্রতিটা মানুষেরই অবশ্যই থাকা উচিত। সেটা খারাপ হবে কেন?

প্রশ্নটা আসলে এই, যে এই অনুভূতিগুলো ব্রেনের কোন অংশে আসে? এই অনুভূতিগুলোর জন্য প্রধানত ব্রেইনের প্রিফ্রন্টাল করটেক্স (Prefrontal Cortex) দায়ী, যা জ্ঞান, চিন্তা, এবং সামাজিক আচরণের নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও, অ্যামিগডালা (Amygdala) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ এটি আবেগ ও সামাজিক সংকেতের সাথে সম্পর্কিত।

যদিও বিজ্ঞানের ভাষায় এটা ব্রেনের Injury বা এক ধরনের ঘা। সর্বৈব এটা ব্রেনের সার্বিক কার্যক্ষমতা হ্রাস হলে আসে। এর সাথে অনুভূতির সরাসরি সংযোগ নেই। তাহলে এটা মনে হতে পারে যে কার্যক্ষমতা হ্রাস পেলে সে তো প্যারালাইজড হবে, অহংকারী হবে কেন?

তার উত্তর এটা হতে পারে যে ঐ কার্যক্ষমতা হ্রাস পাওয়া মানে সবক্ষেত্রে শারীরিক ভাবে অক্ষম হওয়া নয়। ভেবে দেখুন সুস্থ ভাবে চিন্তা না করতে পারাটা কি এক ধরনের অক্ষমতা বলেই মনে হয় না? আঘাতের কারণেই ক্ষত হবে এমনটা নয়। ইনফেকশন্ যে ক্ষত তৈরি করে তাতে আঘাত প্রয়োজন থাকে না। যেমন Bed Sore এ আঘাত থাকে না। তাই বিজ্ঞান বলে এটা একটা Injury অর্থাৎ ঘা। এই নিয়ে Google এ প্রচুর Article আছে।

মস্তিষ্কের লিম্বিক সিস্টেম ও হাইপোথ্যালামাস আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে। অহংকার বা আত্মসম্মান একধরনের আবেগ পরিচালিত ঘা।

অনুভূতির আরেকটা দিক ভালোবাসা, সম্পর্ক, ঘৃণা, বিচ্ছেদ এই বিষয়গুলোই বা কিভাবে, কার দ্বারা পরিচালিত হয়...? মন না মস্তিষ্ক...? ভালোবাসা কি নিঃস্বার্থ...?

যে কোন ধরনের ভালোবাসার বিষয়েই প্রশ্নটা আসতে পারে... বাৎসল্যপ্রেম, দাম্পত্যপ্রেম, বন্ধুত্বপ্রেম, মা বাবার প্রতি ভালোবাসা, দুস্থঃদের প্রতি ভালোবাসা, আধ্যাত্মিক প্রেম... আরো যা যা আছে সব ক্ষেত্রেই যদিও এই রহস্য ভেদ করার মতো মানুষ আমি নই... তবুও অনেক আর্টিকেল, অনেক ধরনের বই এবং ইন্টারনেট ঘেঁটে যেটা আমরা মনে হয়েছে—ভালোবাসা ফুরাতে না দেওয়াটাই ভালোবাসা। আর এটার জন্য প্রয়োজন ব্লাইন্ড লয়্যালটি এবং কর্তব্যের সংমিশ্রণ।

আনুগত্য তৈরি করে শ্রদ্ধাবোধ এবং বিশ্বাস। আপনি আপনার ভালোবাসার ব্যাক্তি বা বিষয় সম্বন্ধে যত কম জানবেন তার প্রতি আগ্রহ তত বেশি থাকবে। সব জেনে যাওয়া মানেই সকল আগ্রহের পরিসমাপ্তি। যত বেশি জেনে যাবেন, দেখবেন ধীরে ধীরে তার বা সেই বিষয়ের প্রতি তৈরি হচ্ছে অনাস্থা, অবিশ্বাস আর ভরসাহীনতা। অনাগ্রহ বা নিঃস্পৃহতার অশুভ সূচনাও সেখান থেকেই শুরু। সৌন্দর্য দেখতে হয় দূর থেকে, যত কাছ থেকে দেখবেন, তত বেশি ত্রুটি ধরা পড়বে। সৌন্দর্য্যের বিচার অখণ্ডতায়, খণ্ডিত সৌন্দর্য্য বলে কিছু নেই।

যে ছবি যত বেশি জুম করবেন, সে ছবির ফাটা দাগ

তত বড় বড় করে ধরা পড়বে। তাই দাগ দেখতে না চাইলে যেমন ছবিকে বেশি জুম করতে নেই, ঠিক তেমনই আপনার প্রিয় মানুষটির সম্পর্কেও বেশি জানতে নেই... সেই ভুল করলে উল্টে নিজের মধ্যেই মানসিক যন্ত্রণা বাড়তে থাকবে। হয় সরে পড়ুন নয়তো মেনে নিন... ব্যাস। মাথায় রাখুন এই পৃথিবীতে কারোরই সবকিছু আপনার মনের মতো হবে না, আবার আপনার সবকিছুও কারোর মনের মত নয়।

সম্পর্ক হল—মানুষের সেই সন্ধান এবং পাওয়া, যেখান থেকে বেরোনো যাবে না; কর্তব্য দিয়েই ধরে রাখতে হবে... তাই সব কিছুই উপভোগ করুন... শরীর, মন, রূপ, খুঁত, সবকিছুই...

নন্দিতা রায়ের বেলাশুরু মুভির ঐ যে কথাটা—''একটা সময়ের পরে আকর্ষণ থাকে না, থেকে যায় বন্ধুত্ব...'' বন্ধুত্ব আমাদের জীবনের অমূল্য সম্পদ, যা আমাদের মানসিক, আবেগগত এবং সামাজিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। সঠিক বন্ধুরা আমাদের জীবনের প্রতিটি ধাপে শক্তি জোগায় এবং একে অপরের সুখের কারণ হয়ে উঠি। সেখানে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, সহানুভূতি এবং বোঝাপড়া থাকে। এখানে কেউ কারো বৈশিষ্ট বা ভুল নিয়ে বিচারে বসে না বরং অনুভূতিকে প্রাধান্য দেয়, মনের ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়। যার কাছে মনের কথা নির্দ্বিধায় প্রকাশ করা যায়। যে আপনার পাশে থাকে, বিশেষ করে আপনার কঠিন সময়ে। একজন ভাল বন্ধু শুধুমাত্র আনন্দের সঙ্গী নয়, সে একটা মানসিক সাপোর্ট সিস্টেম, মানসিক শান্তি, সুখ, স্বস্তি এবং সমর্থন।

যে কোনো ভালোবাসা বা সম্পর্কের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কর্তব্য। আর এর জন্য প্রয়োজন অর্থ। এই দিক থেকে দেখতে গেলে কেউই আপনার প্রিয়জন নয়, সবই প্রয়োজন। সমস্ত রকমের ভালোবাসা, সম্পর্ক, ফ্যান্টাসি... যা কিছুই আছে না কেন...সব সব সব।

তাই ভালবাসাসৃষ্ট সম্পর্কের সাথে কর্তব্য এবং কর্তব্যের সাথে অর্থ চক্রাকারে আবদ্ধ। কর্তব্য করতে পারলেই ভালোবাসার সম্পর্ক টিকে থাকবে... আর না পারলেই শুরু হবে ঘৃণা, হিংসা, বিচ্ছেদ।

তাই, কোনো ভালোবাসাই নিঃস্বার্থ নয়। সে যে-কোনো ভালোবাসাই হোক না কেন... ভালোবাসার বিষয়ে আমরা আমাদের মনকে যা ভাবাই, আমাদের মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণে আমরা তেমনই আচরণ করি। দ্বিমত থাকতেই পারে তবে কোনটাই স্বতঃসিদ্ধ নয়। গভীর ভাবে ভাবলে এটা দেখা যাবে, আমরা তাকেই ভালোবাসি যাকে আমার মন চায়... তার মানে আমরা পরোক্ষভাবে মনের খোরাক নামক স্বার্থ চরিতার্থ করতেই ভালোবাসছি, এবং এই ভালোবাসতে-বাসতেই তার প্রতি রিটার্ন ভালোবাসা, কর্তব্য, আনুগত্য আশা করছি। দুঃস্থ কে দান করে পুণ্যের আশা, বাৎসল্য প্রেমের প্রতিদানে বার্ধক্যের সাহারা, দাম্পত্যপ্রেমের পরিবর্তে সারাজীবনের সঙ্গী পাওয়ার আশা... আধ্যাত্ম প্রেমের বদলে স্বর্গলাভের আশা.... এগুলো কি শুধুই মনের আবেগ, নাকি এখানে হিসেবী মস্তিষ্কের স্বার্থপর দেনাপাওনা জড়িত...!!!!

যাদের মন আরও পরিণত, মস্তিষ্কের খেলায় আরো পরিপক্ক তারা তো ভালবাসার দোহাই দিয়ে সম্পর্কের খেলায় আরও এক কাঠি উপরে... আরো ভালভাবে বললে বলা যায়, ইমোশনাল লোকেরা সম্পর্ক যেন-তেন-প্রকারেণ টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে, প্র্যাক্টিক্যাল লোকেরা সম্পর্কের সুবিধা নেয় আর প্রফেশনাল লোকেরা সুবিধা দেখেই সম্পর্ক তৈরি করে।

ইগো, অহংকার, ভালবাসা, সম্পর্ক, আত্মসম্মান, হিংসা, বিচ্ছেদ... মন ও মস্তিষ্কের এই আচরণগত খেলাগুলো আমরা কেন করি?? হয়তোবা অন্যের থেকে এগিয়ে থাকার প্রতিযোগিতা, সাফল্য, টাকা পদোন্নতি, অন্যের চোখে নিজেকে মহান প্রমাণ করা... ব্লা ব্লা ব্লা....

আমরা যদি বেস্ট হতে না চেয়ে উত্তম হতে চাই তাহলে এগুলো না করলেও এগিয়ে থাকবো... নিজের কাছে এবং সমাজের কাছে। কথায় আছে না ''উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে, তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে...''। উত্তম মানুষ হতে গেলে শুধু বুদ্ধি থাকাটাই পর্যাপ্ত নয়... এই বিষয়টা বৈজয়ন্ত বিশ্বাস ভিক্টর নামক একজন ব্যক্তির আর্টিকেলে আমি প্রথম দেখেছিলাম।

উত্তম মানুষের চার ধরনের বুদ্ধিমত্তা থাকে—

১. Intelligence Quotient (IQ) —সমস্যা চেনার এবং সমাধান করার ক্ষমতা।

২. Emotional Quotient (EQ)—মানসিক বুদ্ধিমত্তা, আত্মসচেতনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং দায়িত্বশীল হয়ে ওঠার যোগ্যতা নির্ধারণ করে।

৩. Adversity Quotient (AQ)—হাল ছেড়ে না দেবার মানসিকতা, প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অতিক্রম করার ক্ষমতা নির্ধারণ করে।

৪. Social Quotient (SQ)—অন্যদের সাথে যোগাযোগ তৈরি করার ক্ষমতা যা সামাজিক বুদ্ধিমত্তা এবং সচেতনতা নির্ধারণ করে।

এই উত্তম মানুষরাই বাস্তব জীবনে উচ্চ পদাধিকারী, শিল্পপতি, সিস্টেমের চালিকাশক্তি বা পাবলিক ফিগার। আর শুনতে অদ্ভুত লাগলেও এটা সত্যি পেশাগত জীবনে প্রায় ক্ষেত্রেই অধিক IQ সম্পন্ন একজন মানুষ উচ্চ EQ– SQ এবং AQ সম্পন্ন একজনের অধীনে কাজ করে। উদাহরণ স্বরূপ একটি কোম্পানির কর্মচারীর IQ অনেক বেশি, অপরদিকে কোম্পানির মালিকের IQ কম থাকলেও EQ, SQ এবং AQ বেশি থাকে। তাহলে সাফল্যের জন্য মন মস্তিষ্কের যে খেলা আমরা খেলি... কথায় কথায় ইগো, অহংকার, অসুস্থ প্রতিযোগিতা, সম্পর্কের টানাপোড়েন, ভালো সম্পর্কের নামে মিথ্যা অভিনয়, বিচ্ছেদ, অর্থের রোজগারে অধম পথ নিয়ে থাকি... তার কতটা প্রয়োজন...????

In conclusion, there are four types of intelligence that are crucial for success in all areas of life: intelligence quotient (IQ), emotional quotient (EQ), social quotient (SQ), and adversity quotient (AQ). While IQ is important, it's not the only factor that determines success.

পুনর্মিলন

সুব্রত চৌধুরী
(প্রবেশবর্ষ : ১৯৮৩)

চেনা মানুষগুলো, মনে হয়
কত কালের অচেনা।
স্মৃতির অতল-গভীর থেকেও
মনে যাচ্ছে না আনা।

কচিমুখগুলো কেমন যেন,
আমূল বদলে গেছে।
সময়ের নিষ্ঠুর পরশ, তাতে
বয়সের ছাপ ফেলেছে।

একদিন হেথা যাদের, ছিল
সদম্ভ পদচারণা।
এখন সেথায়, তাদের নানান
স্মৃতির অবতারণা।

প্রিয় মোদের, সত্যানন্দ ছাত্রাবাস
শিক্ষার আধার।
নারকেল, আম, কাঁঠালের মাঝে
বৃহৎ আকার।

আবাসিকরা, সর্বত্র আছে কর্মরত
অফিসে শিক্ষালয়ে।
পালন করিছে, সকল কর্ম
আপন গরিমা লয়ে।

একরাশ সুসংবাদ বয়ে
নিয়ে এল যারা।
বেঁচে থাক পুনর্মিলন
বেঁচে থাক তারা।

যকৃত

মনোরঞ্জন ঘোষ
(প্রবেশবর্ষ : ১৯৮৫)

শরীরটাকে রাখতে ভালো
সকালবেলা মাঠে চলো
ঘাম ঝরবে মেদ ঝরবে
ঘুমটা যে সুন্দর হবে।

সময় মত খাওয়া দাওয়ায়
যকৃতটা যে ঠিক থাকে
সংসারকেও সুখে রাখবে
পকেটটাও সঠিক থাকবে।

প্রত্যেক দিন খাও শাকসবজী
দেখবে নতুন জীবনটাকে
মাছ মাংস আর তেল মশলাতে
যকৃতটাকে করো না শেষ।

নিয়মিত ব্যায়াম যোগাসনে
জরা ব্যধি দূর করে
রক্ত চলাচল ঠিক রাখে
মানসিক চাপ দ্রুত কমে।

বয়স হলেই ভাবনা যত
মাথায় বসে চেপে
সুস্থ শরীর হৃদয় ভাঙে
মনের বয়স হলে।

বয়স বাড়লে এমন হয়
বাড়ে নানান রোগের ভয়
তাদের গুতোগুতি
সুস্থ থাকতে ব্যায়াম করি।
খুব সকালে উঠি।

ওরা শপথ নেয় কসমও খায়

মোহাম্মদ সাদউদ্দিন

(প্রবেশবর্ষ : ১৯৮৬)

রক্ত-চাবুককে এখন বাগ মানানো যাবে না
রক্ত-মশাল এখন রক্তের উপরে
দাউদাউ করে জ্বলে
রক্তাক্ত ইতিহাস তারা এইভাবেই
তৈরি করে হাল বদলাতে
রবজারি আর হুমকি-সংস্কৃতিকে প্রতিহত করতে
ওরা শপথ নিয়েছে।

আমাদের কর্ম-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানগুলি
দালালিতে ভরা
গুণ্ডারাজ আমাদের ভালো কিছু
করতে দেয় না
আমাদের প্রতিটি সকালকে
সিণ্ডিকেট-রাজ ধর্ষণ করে
আমাদের প্রতিটি সন্ধ্যাকে
দুরবৃত্তরা বলাৎকার করে
মানুষের ক্ষোভ আজ
রাজপথে দিশা খুঁজতে চায়
মানুষের জন্য তারা আজ
আইনকে তুলে নিতে চায়
আজ সব হিসাব পাল্টে দিয়ে
নতুন কিছু করতে চায়
ওরা শপথ নেয়
ওরা কসমও খায়।

সমাকলন

সিদ্ধার্থ ঘোষ

(প্রবেশবর্ষ : ১৯৮৯)

এ বড় দুঃসময়
পথভ্রষ্ট রৈখিক প্রোগ্রাম
গতিশীল বিন্দুর
ক্রমাগত দিক পরিবর্তন।
অবঘাতে উন্নয়ন
অবিন্যস্ত রাশিতথ্য,
এলোমেলো পরিসংখ্যান।
ক্যালকুলেশনের সেই যে শুরু
শুধুই 'অবকলন'।
চ্যাপ্টার এবার সমাপ্ত হোক
শুরু করো 'সমাকলন'।

হারানো শ্রাবণ

করুণাসিন্ধু মণ্ডল

(প্রবেশবর্ষ : ১৯৯০)

মেঘেদের গম্ গম্ বৃষ্টি ঝম্ ঝম্ শ্রাবণের ধারা,
কৃষকের আহ্বানে তাই মেঘ দিত সাড়া।

খালেবিলে ডোবা জলে মাছেরা তো নড়ত,
কই, পুঁটি খলসেরা বেশ মাতামাতি করত।

আলে চলে শামুকেরা, কাদাতে কাঁকড়া,
চিংড়িরা দল কত ঘাস পেলে ঝাঁকড়া।

ঝিনুকের বাসা ছিল পুকুরের জলে ভাই,
তারাও কি অভিমানী? আজ তাই দেখা নাই!

সন্ধ্যায় শোনা যেত ভেকেদের কত গান,
পাশে বসে ঝিঁঝিঁ পোকা একটানা দিত তান।

দিনশেষে ঘরে যেত কাজ সেরে চাষিরা
তালশাঁসে কত তালবড়া ভাজত মা-মাসিরা।

মিছিল করত কত আলো জ্বেলে জোনাকি,
উল্টো চালে পাল্টে গেল প্রকৃতির পালা কি?

বৃষ্টির জলে আজ আর খালবিল ভাসে না,
সন্ধ্যা হলে বিজলী রাণী আকাশেতে হাসে না!

ঋতু বুঝি পাল্টে গেল, বদলে গেল আবহাওয়া,
নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে করছি গা-সওয়া।

ক্ষণেকের সুখের তরে কাটছি কত বন,
আজকে তাই খুঁজে ফিরি হারানো শ্রাবণ।

ভয়াবহভাবে ভালোবাসলে

অনিরুদ্ধ দাস

(প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৪)

কাগজের নৌকা নিয়ে নদী পেরোতে নেই
মনে রাখবে রাধার আয়ান ছিল
আবার কেষ্টঠাকুরও ছিল বাঁশি হাতে,
নিশ্চিত মৃত্যু জেনে যুদ্ধে নামায়—
বীরত্ব থাকতে পারে কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ না
তাই ভয়াবহভাবে কাউকে ভালোবাসতে নেই
গভীর চুম্বন না পেলে কি হবে ভালোবেসে

হাসতে হাসতে আগুন পান করে
কি যে পেলাম—উল্কার আলো
উঠে আসে তার রাঙা ঠোঁটের কোণে...
ব্লাউজের লটকার মতো ঝুলে আছি
না পেলাম মন না ক্লিভেজের ওম্
ভয়াবহ ভাবে ভালোবাসলে—
ভাগ্যরেখায় পড়ে ছেদ।

তাই ভালো ভেবে ভালবাসতে নেই
বিজন গোপন সংগোপনে...

আমাকে তুমি চুপ করিয়ে দিলে

সুজিত কুমার দাস
(প্রবেশবর্ষ : ১৯৯২)

আমাকে তুমি
চুপ করিয়ে দিলে!
একদম চুপ করিয়ে দিলে।
আমার কথা তুমি শুনলে না
আমার কথা শোনার কেউ নেই!
তাই আমি
চুপি চুপি
নিজের সঙ্গেই কথা কই।
অথচ —
আমার কথাগুলো
শোনার মতো; বিচার করার মতো।
তবুও
আমার কথা
না শুনে
আমাকে তুমি
চুপ করিয়ে দিলে!

আসলে
উঁচু গলায়
কথা বলা
আমি পছন্দ করি না।
অহেতুক তর্ক
ভালো লাগে না আর।
তাই—
চুপ মেরে গেলাম।
আসলে
গলার জোরে
আমাকে তুমি
চুপ করিয়ে দিলে।

আমার ও গলা আছে।
গলার জোর ও আছে।
তবুও
চুপ মেরে গেলাম।
চুপ হয়ে গেলাম।
ভয়ে কিন্তু নয়;
ভদ্রতায়।

আমাকে তুমি
চুপ করিয়ে দিলে।
অথচ
আমার কথাগুলো
না শোনার মতো নয়।
তবুও—
আমাকে তুমি
চুপ করিয়ে দিলে।

চুপ হয়ে গেলাম,
মানে এই নয় যে—
আমার কথাগুলো মিথ্যা।
না শোনার মতো।
তবুও—
চুপ মেরে গেলাম।
গলার জোরে
চুপ করিয়ে দিলে
তাই।

আমি কিন্তু
আমার কথাগুলোকে
আমি নিজেকে বলেছি
বারবার।
নিজেকে প্রশ্নবিদ্ধ করে
জানতে চেয়েছি—
আমার কথাগুলো কি ঠিক?
কথাগুলো কি
না শোনার মতো?

উত্তর পেয়েছি—
বারবার
এক ই—
ঠিক ঠিক ঠিক।
হাতে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে
দুচোখ বাধা
রমনীর মতো হয়ে
বিচার করেছি নিজের।
উত্তর পেয়েছি—
ঠিক ঠিক ঠিক।

অথচ—
আমাকে তুমি
চুপ করিয়ে দিলে!

স্মৃতিগাঁথা

বিষ্ণুচরণ পাল
(প্রবেশবর্ষ : ২০০৪)

সময়ের ধূসর পাতা
নিভে যাওয়া রবি,
লেগে থাকা কালো ছোপ
জীবনের জলছবি।
বারে বারে শুধু তাই
ফিরে যায় মন,
যতই যা বলি না
শোনে না বারণ।
অচেনা মুখের সারি
অদ্ভুত শাসন,
ভালো কিছু না লাগার
প্রথম সমীকরণ।
আপন থেকে দূরে
একা একা থাকা,
রুম নাম্বার তেরো
আরও তিনটে বোকা।
খুলে যায় জট
একে একে সব,
'সত্যানন্দের জয়'
মুখে মুখে রব।

খোলা আকাশের নীচে বসতি আমার

ওয়াকিফ মোহাম্মদ সাহিন
(প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৫)

খোলা আকাশের নীচে বসতি আমার
নেই আয়োজন আহামরি
তোমার প্রেমে বিভোর আমি
এভাবেই বাঁচি মরি
দুহাত এখনো শক্ত আমার
এখনো লড়াই জারি
ভেবোনা আমি হাল ছেড়েছি
হেরে গেছি পুরোপুরি
হতাশা আমায় করে না গ্রাস
একটু ঝাঁকায় শুধু
এ মরুভূমিতেই ফোটাবো ফুল
যতই দেখাক ধুধু
বানাবোই এক পৃথিবী নতুন
তোমার জন্য নিশ্চিত
ঘাসের পৃথিবী নীড়ের পৃথিবী
আলোর পৃথিবী ঝিকমিক
কয়েক জন্ম কালের কাছে
এমন কিছু নয়
তোমার আমার প্রেমের গাঁথা
দিব্যি বেঁচে রয়।

নারীদুর্গা

আবু তাহের মাসুম রাজা

(প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৬)

শক্তি নিয়ে নারী, সমৃদ্ধির পথে চলে,
জীবনের যাত্রায়, তার স্মৃতি গুনী ভোলে।
কখনো মা, কখনো বন্ধু, স্বপ্নের গহনে,
দুর্গার মতো চোখ, আকাশের নয়ন।

দশভূজা না থাকুক, কিন্তু আগুন জ্বলে,
জীবনের ভোরের মধ্যে, আলোর ছায়া বলে।
কখনো সে কোমল, কখনো শক্তির দৃষ্টিতে,
চলে যায় চিরদিন, হোক না কেন দুঃখের বৃষ্টি।

শক্তির প্রতীক তুমি, জীবনে এনে দাও রূপ,
ছোট ছোট স্মৃতি, ভরে রাখে ধূপ।
প্রতিটি রূপে দুর্গা, তার আনন্দের ছায়া,
নারী শক্তির উৎস, এ কি সুন্দর মায়া।

নারী যে শক্তি, আকাশের চেয়ে বড়ো,
সকলের সাথে তুমি একত্রিতা বজায় রাখো।
জীবনের পথে পথে, শক্তির গান শোনো,
দুর্গার মতো, সৃষ্টি, তুমি কি প্রকাশ করো।

প্রগতি

মহঃ শুকুরুদ্দিন মল্লিক

(প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৭)

অন্ধকারে তোমার উদ্ধত চলন। নিষ্ফলা মাটি, মায়ের বুকে হাহাকার—তাঁর শুকনো বুকে শিশুর ব্যর্থ প্রয়াস।

সাজানো গল্পে ভর্তি পাতার পর পাতা! তুমি ধ্রুব সত্য, ইঙ্গিত বলে সে কথা!

মানুষকে চিৎকার করে বলতে হয় আক্রান্ত আমরা, ফুরিয়েছে বাঁচার রসদ তবু ও স্বর্ণসিংহাসনে বধির!

অধিকার কেনাবেচার বেসাতি চলছে অবিরত জিজ্ঞাসার কণ্ঠ বোধ করেছে কেউ। তবুও তোমার প্রগতির রথ ওড়ায় বিজয়কেতন!

নাভিশ্বাস তারুণ্য বাঁচার স্বপ্ন দেখুক দেখেই চলক মদিনের রঙীন সকাল আঁধারের গর্ভ থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখুক!

তবুও মানুষের জয় নিশ্চিত!

অরন্তুদ তুমি অরুন্ধতী

কেরামত আলী

(প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৭, উচ্চ মাধ্যমিক)

তুমি আসার পর
ছোট ছোট বনফুল যেমন মেতে ওঠে
অরুন্ধতী সময়;
কেটে গেছে চাঁদের আলো যেমত

আদলের ফেস্টুন
বিষাদের বিষ নিয়ে সরে যাওয়া
পাখি নাকি নারী
নিয়মের হোঁচট ফিরিয়ে দিতে দিতে
এক কোটি বছর ঝলমলে তুমি আর আমি

এখনই পেছন ফিরো না
দিগ্বিদিক উন্মত্ত হবে
রৌদ্র ঘেরা চুম্বকীয় স্বর
শরতের রক্তক্ষরণ
হিমশাদা হয়ে ডুবে যেতে যেতে
জাপটে ধরে তোমারই ফুলো ফুলো স্মৃতি

মধু মাখা ঘর
ফেলে রেখে ফিরে যেও না

আঙুলের স্পর্শে আমি বেঁচে উঠি
বেদনার অমৃত নিয়ে
রাক্ষুসী পৃথিবী আসে

তুমি সেই বুকে থাকা অশান্ত বায়ু
বিষাক্ত ছোবল যার আমাকে হাসায়

বাতিঘরের ভালোবাসা

রঞ্জিত কুমার সেন

(প্রবেশবর্ষ : ২০০২)

তোমার মনে যখন ভালোবাসা নামেনি
আমি নেমেছি, ধীর পায়ে, চুপিচুপি
নীল আকাশের নীচে;
বসন্তের গন্ধ নিয়ে।

তোমার মনে যখন ভালোবাসা নামেনি
তারও আগে;
প্রতি সন্ধ্যায় আমি নেমেছি
এক ফোঁটা সন্ধ্যা তারার মতো
নিঃশব্দে;

তোমার মনে যখন ভালোবাসা নামেনি
আমি নেমেছি
সরীসৃপের মতো;
নিশীথের প্রতি অন্ধকারে
একান্তে;

তোমার মনে যখন ভালোবাসা নামেনি
রক্তিম সূর্যের আভা নিয়ে
আমি নেমেছি
সদ্য শিশিরস্নাত ফুলগুলির মতো
ক্ষণে ক্ষণে;

তুমি কি বোঝনি সে কথা?
ওগো;
একটি বার চোখ তুলে দেখো,
দিগন্তে;
আজও তোমার অপেক্ষায়;
পশ্চিমে রামধনু এঁকে
দাঁড়িয়ে;
আমার ভালোবাসা!

অচ্ছেদ্য বন্ধন

সন্দীপ দাস

(প্রবেশবর্ষ : ১৯৮৭)

হঠাৎই শ্বাসকষ্টটা কমে গেল। আর শ্বাস নিতে অসুবিধে হচ্ছে না। শরীরের জ্বর জ্বর ভাবটাও কমে শরীরটা ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে। নিজেকে কেমন যেন হালকা মনে হচ্ছে। মনটাও ফুরফুরে হয়ে উঠছে। কোথাও যেন আর কোনো কষ্ট নেই। একটু আগেও শরীরটা নিয়ে যেরকম অস্বস্তি ছিল সেটাও উধাও। ছেলেটা পাশের চেয়ারে বসে ঢুলছে। বয়সটাই বাড়ছে। আসলে তো ছেলে মানুষ। আর এই বয়সে এত ধকল সহ্য হয়!!

মানবের খুব কষ্ট হচ্ছে ছেলেটাকে দেখে। কতটুকু বয়সে মা টাকে হারালো। আর ছোট বয়সে মা হারালে কি হয় সেটা তো মানবের থেকে ভালো কেও জানে না। পরে আর এক মাকে পেয়েছিল, কিন্তু সেতো আসল নয়। আদরের থেকে অনাদরই ছিল বেশি।

যাক, ছেলেটার মুখটা শুকিয়ে গেছে। মা হারিয়ে এবার বুঝি বাবাকে হারানোর ভয়ে কিরকম চুপচাপ হয়ে গেছে। কথাও বেশি বলছে না।

কিন্তু শরীরটা হালকা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনটা যেন ঘরের বাইরে বেরিয়ে যেতে চাইছে। মানব ভাবলো একবার বাইরে গিয়ে হাসপাতাল চত্বরে হেঁটে আসে। ছেলেটাকে আর ডাকতে ইচ্ছে করছে না।

বিছানায় উঠে বসতেই শরীরে জড়ানো সমস্ত টিউব, নানা যন্ত্রপাতির তার সব যেন কিরকম আলগা হয়ে খুলে এলো। মানব অবাক হয়ে গেল। এ আবার কি!! যাক গে ভালোই হলো। হাঁটাচলা করতে আর অসুবিধে নেই।

হাসপাতালের বেড থেকে নামতেই শরীরটা কিরকম তুলোর মতো হালকা মনে হচ্ছে। সে হাঁটছে না ভাসছে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মানব। বারান্দা ধরে হাঁটতে গিয়ে খেয়াল করে হাসপাতালের নার্স, আয়া বা অন্য লোকেরা কেউ তাকে দেখছে বলে মনে হচ্ছে না। ভালোই হলো, সবার নজর এড়িয়ে একটু সামনের লন থেকে ঘুরে আসতে পারবে।

লনের ঘাসে পা ছোঁওয়াতেই, একি!! সামনের মানুষটিকে খুব চেনা মনে হচ্ছে। খুউব চেনা মানুষ। তার দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসছে। যেন মানব তার অনেক দিনের চেনা। কিন্তু মানব যেন চিনেও চিনে উঠতে পারছে না। মানুষটি তার দিকে হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো।

বলে উঠল—কি রে চিনতে পারছিস না।

মানবের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সেই গলা!! একটু ভাঙা আর চাপা। কিন্তু আন্তরিকতায় ভরা। সেতো একজন ছিল। কিন্তু সেই মানুষটা তো বহুদিন আগে নেই হয়ে গেছে। সে আবার কি করে তার সামনে!!

আরও এগিয়ে এলো সেই যেন খুব পরিচিত মানুষটি। আবার সেই হাসি। মানব শিউরে উঠলো। হ্যাঁ, তার মনে পড়েছে। মানব চিৎকার করে উঠলো—শান্তিদা তুমি!!! তুমি কিভাবে!!

আর পারল না মানব। ডুকরে কেঁদে উঠে শান্তিকে জড়িয়ে ধরলো। শান্তি মানবের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল—ধূর পাগল, তুই একই রকম রয়ে গেছিস। কাঁদিস না। তোর জন্য আরও সারপ্রাইজ আছে। আয় আমার সঙ্গে।

মানব বলে—কিন্তু দাদা তুমি তো অনেকদিন আগে...।

শান্তি মানবের মুখ চেপে ধরে। বলে—সেসব কথা পরে হবে। আয়।

মানব বলে—কোথায় যাবো? আমার ছেলে

হাসপাতালের বেডের পাশে বসে আছে। ওকে না বলে আমি কোথায় যাবো?

শান্তি বলে—ও কিছু হবে না। ছেলেকে এবার ছাড়। বড় হচ্ছে তো। এবার ওরটা ওকে বুঝে নিতে দে। কতদিন আর নিজের ডানার আড়ালে আগলে রাখবি? চলে আয়।

মানবের মনটা কিরকম সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। বলে—কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে কোথায় যাবো?

শান্তি মানবের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে ভারি গলায় বলে—ভাই তোকে তো আমার সঙ্গে আসতেই হবে।

মানবের মাথাটা চক্কর দিয়ে ওঠে। কিরকম যেন সব কিছু ওলট পালট লাগে। গোটা পৃথিবী যেন তালগোল পাকিয়ে তার দু'পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। সে দুচোখ বন্ধ করে ফেলে। ক্রমশঃ সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

চোখ খুলতেই জায়গাটা যেন খুব চেনাচেনা মনে হয়। চাঁদের আলোয় দিগন্ত ভেসে যাচ্ছে। আরে এটা তো সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের ছাদ। ওই তো সেই চিলেকোঠার ঘরটা। যেখানে এখন কেউ থাকে না। সামনে খেলার মাঠ জোছনার আলোয় ভেসে যাচ্ছে।

শান্তি মানবের সামনে এসে দাঁড়ায়। শান্তির চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। বলে—মানব ছাদের ওই দিকটা দেখ। মানব ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে ছাদের উপর একটা ছোট্ট জটলা। কিন্তু একি!!! এরা কারা!!! দিলারদা, তাজদা, শুভেন্দুদা, ধনঞ্জয় যাকে ওরা ধনা বলে ডাকে, আর ঢিপ মানে জয়দীপ!!

কিন্তু এরা তো সবাই ....

শান্তি হেসে ওঠে। বলে—খুব অবাক হচ্ছিস তো। আসলে আমরা সবাই এখন নেই জগতে। আর তুইও এখন থেকে আমাদের সঙ্গে।

তাজ এগিয়ে আসে। পাশে শুভেন্দু। বলে—ভাইরে আমরা এখন নেই জগতের লোক। আর আমাদের পার্থিব বাড়িঘর পিছনে ফেলে এখন আমাদের বাস আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় এই ছাত্রাবাস।

শুভেন্দু বলে ওঠে—এ ছাড়া আমরা আর কোথায় যাবো বল ! এখানেই আমরা দাদাভাই সবাই একসঙ্গে নেই হয়ে কাটাবো।

ধনা আর জয়দীপ এসে মানবকে জড়িয়ে ধরে। ওরা যে সেই ইলেভেন ক্লাস থেকে একসঙ্গে ছাত্রাবাসে মানুষ হয়েছে।

দিলার স্বভাবসিদ্ধ সেই চোখ ছোট করে মুচকি হেসে বলে ওঠে —মানব ভাই এই বন্ধন তো আমাদের কোনোদিন ঘুচবে না। আমরা পার্থিব হোক বা ওপারের জগৎ হোক, একসঙ্গেই থাকবো যে।

ছাদের অন্য প্রান্ত থেকে হঠাৎ স্মিত মুখে এগিয়ে আসেন শক্তিবাবু। শক্তিপদ কুইল্যা। বলেন—মানব, এবারও শুনলাম ডিসেম্বরে আমাদের ছাত্রাবাসের পুনর্মিলন। প্রথমবার ২০১৮ র পরে আর আসা হয়নি। তবে এবার প্রত্যেক বছর আমাদের আসা আর কেউ আটকাতে পারবে না।

মানবের দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে আসে। সে কি আনন্দের না দুঃখের!! জানে না। একদিকে একমাত্র ছেলেকে ছেড়ে আসার দুঃখ আর একদিকে হারিয়ে যাওয়া দাদাবন্ধুদের ফিরে পাওয়া। একটা অদ্ভুত অনুভূতি মানবের মনে। জানে না কোনটা বেশি ভালো বা খারাপ। শুধু এটুকু বুঝতে পারছে সে খুব একটা খারাপ নেই।

একটা রাতজাগা পাখি তার কালো ডানা ঝাপটে যেন দুই জগতের মধ্যের দরজা খুলে মানবকে নিয়ে ধীরে ধীরে অন্য জগতে টেনে নিয়ে চলে। নিস্তব্ধ চরাচরে শুধু একলা চাঁদ ভাসতে ভাসতে অমলিন হেসে ওঠে।

** উপরে উল্লিখিত প্রয়াত শক্তিবাবু স্যার, সব দাদা আর বন্ধুদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য।

সেই চাঁদের রাত্রি

সাগর কুমার দাস
(প্রবেশবর্ষ : ১৯৮৪)

আজ বড্ড ঘুম পাচ্ছে। অথচ বাইরে পূর্ণিমার চাঁদ বিরাজমান। এরকম প্রকৃতির রূপ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতেও ভাল লাগছে না। কিন্তু শীতের দিনে চেয়ারে লনটার সামনে আর বসে থাকা যায় না। চল ঘুম মারি। তাপসি তুমি চুপচাপ কেন? কিছু বল? কি কথা বলবে না। তাহলে আমি বলি তুমি চুপচাপ শোন। প্রথম সেই মধুচন্দ্রিমার কথা তোমার মনে পড়ে? ও! সে এক দিন গিয়েছে। তখন প্রায় আমাদের অনুষ্ঠান লেগেই থাকত। আজ সিনেমা, কাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পরশু পিকনিক। তাইতো মাঝে মাঝে মনে হয় 'আমাদের গেছে যেদিন একেবারেই কি গেছে।' হয়ত ভাবছ আমি পাগল হয়ে গেছি। না না, সেটা ভেবো না। একবারই পাগল হয়েছিলাম। তার মাশুল আজও গুনছি। যা বাব্বা এত রাত্রে ফোন কেন?

—হ্যালো, ও মুখার্জীবাবু না-না ঐ ফাইলটা আমার কাছেই আছে, কালকে অফিসে গিয়ে দিয়ে দেব। কি বললেন—কি বললেন। হ্যাঁ হ্যাঁ সকালেই কাজটা সেরে অফিসে জমা দিয়ে দেব। রাখলাম।

যাক যে কথা বলছিলাম। কি কথা বলছিলাম যেন। ছাড় ওসব কথা। তুমি কত সুন্দরী ছিলে বলতো? প্রথম যেদিন আমাদের বাড়িতে পা রাখলে সেদিন সকলের কি প্রশংসা। সবাইতো তোমার কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বন্ধুরা সবাই আমাকে কত কি শ্লোক শোনাতো। আমারও বুক ভরে যেত। যদিও বিয়ের আগে তোমাকে আমি ভাল করে দেখিনি। না, তুমি ভেবো না এখন তোমার রূপ চলে গিয়েছে। এখনও তোমাকে সেই ফুলশয্যার রূপে যেমনটি দেখেছি তেমনটি এখনও লাগে। সত্যি কিনা বল? তা না হলে বন্ধুরা তোমার এখনও প্রশংসা করে কেন?

এই চাঁদের রাত্রে মাঝে মাঝে উদাস হয়ে যেতে বেশ লাগে। গ্রীষ্মের দিনে ছাদে বসে তোমার সঙ্গে কত গল্প, কত হাসি, কান্না। তবে হাসির কারণটা জানলেও কান্নার কারণটা জানাও নি। তুমি বলতে চাইতে না। কেমন যেন কিন্তু কিন্তু ভাব। কি বললে, কোন কিন্তু ছিল না। এমনিই কাঁদতে। কেউ কি এমনি এমনি কাঁদে। আসলে আমিও যে একটু একটু অনুমান করতে পারি নি তা নয়। তুমিই বল না কি কারণ। কি বললে না যে। 'এমনিই'। তাহলে আমারও কোন কারণ নাই। আচ্ছা তুমি বিয়ের আগের ঘটনা কিছু বলো না। যা বাব্বা তুমি বলবে না। আমার ঘটনা শুনবে। সব বলতে হবে আমাকে। সত্যি করে বলব। বলি। জান আমি একটা মেয়েকে ভালোবাসতাম। সেও আমাকে ভালোবাসত। সে আমাকে চিঠি দিত আমিও ওকে চিঠি দিতাম। ঠিকানা ঠিকমতো জানতাম না। পিওনের সহানুভূতির ফলে চিঠিটাও পেয়েছিল। উত্তর কিন্তু পেয়েছিলাম। খুব সরলভাবে দু চার কথা। জান সেদিন ট্রেনে হঠাৎ ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেউ কাউকে প্রথমে কথা বলতে পারিনি। ওর পতিদেবতা ওর পাশেই বসেছিল। বেশ সুন্দর গোলগাল ভদ্রলোক। অনেক কথাই ঠোঁটের আগে এসে থেমে যাচ্ছিল। সেও করুণভাবে তাকিয়েছিল আমিও ছিলাম। ও একটা পত্রিকা পড়ছিল। ভদ্রলোক আনমনে খবরের কাগজ পড়তে ব্যস্ত ছিলেন। আমিও পত্রিকাটি একটু পড়তে লাগলাম। আমি আগে নেমে গেলাম। যাওয়ার আগে একটা দেশলাই কাঠি বইটাতে খুঁজে দিয়ে এসেছিলাম। কি আবার ঘুমালে নাকি? আচ্ছা তোমার ঝুমকির কথা মনে আছে। ও সে এক রাত্রি গিয়েছে। কোন বাড়ির মেয়ে ছিল আর কোথায় এসে হাজির হয়েছিল। রাত্রিবেলায় দরজাটা খুলে

দিলাম। ঝুমকি ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিল। হাঁপাতে লাগল কোন কথাই বলতে পারছিল না। একটু পরে কয়েকটা ছেলে দরজাতে টোকা দিল। তখন সে ভিতরে যেতে চাইল। ঝুমকিকে ভিতরের ঘরে রেখেছিলাম। তারপর দরজা খুললাম। ছেলেগুলো বলল কোন মেয়ে আপনার ঘরে এসেছে। আমি 'না' বলে ওদের বাইরে বের করে দিলাম। তুমি বাথরুম থেকে মেয়েটাকে বের করে আনলে। ও লাজুক ছিল। খেতে দিতে গেলে খেতে চাইল না। তুমি যেতে দিলে না। ও বারবার চলে যেতে চাইছিল। ধাতস্থ হওয়ার পর টিফিন খেল। ঝুমকি আমাকে কিছু না বললেও তোমাকে সব বলেছিল। মাঝে কয়েকবার আবার আমাদের বাড়ি এসেছিল। তখন আমার সঙ্গে অনেক কথা বলেছিল। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে ঝুমকি। পড়াশোনায় মন্দ ছিল না। প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর। হাসি সব সময় লেগেই থাকত। কলেজে ভর্তিও হল। একটা ছেলের সঙ্গে পরিচয় হল। সে তার জীবনের ভার নিতে চাইল। বিশ্বাস রেখে ঝুমকি তার হাত ধরে চলতে লাগল। হঠাৎ বাবা-মা দুজনেই চলে গেলেন। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ছেলেটা তখন বাইরে চাকরির খোঁজে। প্রতিবেশীরা তখন একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিল। ছেলেটার শুধু অথর্ব পিতা বর্তমান। ছেলেটা কিন্তু সৎ। দিনমজুরি করে কোনরকমে দিন যায়। তাদের একটা কন্যাসন্তান হল। পিতার শরীর দিন দিন খারাপ হতে লাগল। ওষুধের প্রয়োজন। কিন্তু টাকা কোথায়। বাধ্য হয়ে ঝুমকিকে রাস্তায় নামতে হল। অনেক জায়গা ঘুরতে ঘুরতে একটা মহিলাদের কারখানার কাজ পেল। কারখানা না বলে কুটির শিল্প বলাই ভাল। ধূপবাতি তৈরি করতে হয়। মালিক পুরুষ। আরও কিছু পুরুষ সেখানে কাজ করে। প্রথম দিন বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েই কারখানায় ঢুকেছিল। অতিরিক্ত কাজ করলে অতিরিক্ত মাইনে দেওয়া হবে এ রকম ব্যবস্থা ছিল। এখন ঝুমকি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। সেই প্রাণচঞ্চল মেয়েটি প্রায় বধির হয়ে গিয়েছে। কারখানায় প্রায় কথাই বলে না। মেয়েরা তার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে চায় কিন্তু সে মুখ খোলে না। এক কর্মীর ব্যাপারটা চোখে পড়ল। সে কিছু দিন তাকে লক্ষ্য করেই গেল। একদিন কাজ করে ঝুমকি বাড়ি ফিরছিল বাচ্চা কন্যাটিকে নিয়ে। রাস্তায় স্বামী কাজ করছিল। ইচ্ছে এক সঙ্গে বাড়ি আসবে। স্বামী কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে। ঝুমকি একটু দাঁড়াল। কাজ শেষ হলে দুজনে একসঙ্গে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে লাগল। একটু দূরে একটা পুলিশ মটর সাইকেলে বসে আছে। ওরা পেরিয়ে যেতেই পুলিশটি ঝুমকিকে ডেকে বলল—আরে তুমি এমনভাবে পেরিয়ে যাচ্ছ যেন আমাকে চিনতে পারোনি। পুলিশটি বলল—আচ্ছা তো তুমি কোন কথা না বলেই চলে যাচ্ছ। আমি চাকরি খুঁজতে চলে গেলাম, বাড়ি এসে তোমার কোন পাত্তাই পেলাম না। আমার জন্য একটু ধৈর্য্য ধরতে পারলে না। অথচ আগে কত প্রতিজ্ঞা করেছিলে। ঝুমকি কিছু বলল না। শুধু মনে মনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আর মনে মনে বলল—তুমি যদি নারীর মনের কথা জানতে তাহলে একথা বলতে না। মেয়েরা সমাজকে কেমনভাবে দেখে সেটা তো জান না। তার পরিণতি সে হাতে হাতে পাচ্ছে। জানি না এর শেষ কোথায়।

কোন কথা না বলেই চলে এল ঝুমকি। স্বামী জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিল 'ও চিনতে ভুল করেছিল' কাকে বলতে কাকে বলে ফেলেছে।

কারখানায় একটা ছেলে কিন্তু তাকে প্রত্যেকদিন লক্ষ করত। অন্যান্য সহকর্মীরা সবাই বলল কি ব্যাপার রে পরস্ত্রীর দিকে এমন চোখ। কিন্তু সে কোন কথাই বলত না। একদিন পরিচয়ের সুযোগ এল। অন্যান্য মেয়েরা তাকে ঐ দিন চেপে ধরল। তুমি কোথায় থাক, স্বামী আছে কিনা, বাড়ি থেকে রাগ করে পালিয়ে এসেছো কিনা, তোমার কাছে যে ছেলেটা ছিল ওটা কে ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনও উত্তর দিল না ঝুমকি। কিন্তু ওদের জ্বালাতনে টিকতেও পারল না। একটু দূরে গিয়ে কাজ করতে লাগল। টিফিনের ঘণ্টা বাজলে সবাই গেলেও ঝুমকি গেল না। গেল না বলাটা ঠিক হবে না। টিফিনের পয়সা কোথায়। অসুস্থ বাবাকে দেখতে হবে। তার ওপর স্বামী ও ছেলে। তার কি টিফিন করা হয়। একটু জল খেয়ে নিল। ছেলেটা সব লক্ষ্য করল। সেও টিফিন করতে পারল না। আস্তে আস্তে ঝুমকির কাছে এগিয়ে এল। ওর ভয় করতে লাগল। ছেলেটা নির্দ্বিধায় পাশে

এসে বসল তারপর একটু হেসে বলল—আপনার টিফিন নাই নিশ্চয়। কোনও দিন টিফিন খান না নিশ্চয়। ঝুমকি মাথা নত করল। ছেলেটা নিজের টিফিন ব্যাক্স থেকে দুটো পরোটা বের করে হাতে দিতে গেল। ঝুমকি নিল না। শুধু বলল—আমার খিদে নেই। ছেলেটি হাতে ধরে বলল—এটা যদি আপনার ভাই দিত তাহলে কি আপনি এভাবে ঠেলে ফেলে দিতে পারতেন। ধরে নিন আমি আপনার ভাই। ঝুমকি কোন কথা বলল না। শুধু শুষ্ক মুখে ছেলেটার দিকে একবার তাকাল তারপর হাতটা বাড়িয়ে দিল। ছেলেটা হাতে পরোটা ধরিয়ে দিল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল। ঝুমকি পরোটা হাতে চুপচাপ সেইভাবেই বসে থাকল। একটু পরে এক মহিলাকর্মী এসে বলে গেল মালিক বলল আজ তোমাকে ওভারটাইম করতে হবে। কাজ শেষ হলে সবাই চলে গেল কিন্তু ঝুমকি গেল না সে কাজ করেই চলল। এদিকে মেয়েদের যে প্রধান তাকে হাত করে কিছু টাকা দিয়ে তার বাসনা পূর্ণ করার জন্য মালিক ঝুমকির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হঠাৎ মালিকের এই আচরণে সে হতবাক হয়ে গেল। মালিককে সে ভালো লোক হিসাবেই জানত। কিন্তু এই কি তার নমুনা। পরক্ষণে নিজেকে সে সামনে নিল। কোন রকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দরজা দিয়ে সোজা রাস্তায়। ছুটতে লাগল রাস্তা দিয়ে। রাস্তায় লোক সমাগম কম। মালিকও পিছন পিছন ছুটতে লাগল। কয়েকজন লোকও ধাওয়া করল। মালিক বলতে লাগল আমার পকেট মেরে পালাচ্ছে। ঠিক ঐ সময় সেই পুলিশটা রাস্তায় পাহাড়া দিচ্ছিল। মালিকের কাছে খবর পেয়ে দুটো কনস্টেবল নিয়ে পিছন পিছন ধাওয়া করল। ঝুমকি পড়ি মরি করে আরো জোরে দৌড় লাগাল। গলির মধ্যে ওর বাসাটা। বাসা বলতে কোন রকমে মাথা গোঁজার জায়গা। পুলিশ বাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। পাশে একটা লোক দেখতে পেয়ে পুলিশটি জিজ্ঞেস করল 'আচ্ছা একটা মেয়েকে এদিকে যেতে দেখেছে লোকটি নির্বিঘ্নে ঝুমকির বাড়িটা দেখিয়ে দিল। পুলিশ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। সামনেই ঝুমকিও তার স্বামী দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশটি ঝুমকিকে দেখে অবাক হয়ে গেল। একি—তুমিই রাস্তা দিয়ে ছুটছিলে। শেষ পর্যন্ত তুমি এই কাজে নেমেছো। এর থেকে সরতে পারনি। দাও যে টাকা চুরি করেছো সেগুলো ফেরৎ দাও। ঝুমকি বলল—এ আপনি কি বলছেন? আমি চুরি করেছি! হায় ভগবান আর কত পরীক্ষা আমায় দিতে হবে। এর থেকে সরলে শান্তি পেতাম। কিন্তু এদের মুখের দিকে তাকিয়ে সেটাও পারছি না।

পুলিশ বলল—ও তাহলে ওটা তোমার স্বামী। এই ঘরে তোমার বিয়ে হয়েছে। থাক ও সব কথা। আমাকে ব্যাগটা ফেরৎ দাও।

—ব্যাগ কোথায় হঠাৎ বলে উঠল ঝুমকি। তখন পুলিশটি বুজে থাকা হাতটা ধরে টান দিল। সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে পরোটাগুলো ছড়িয়ে পড়ল। অসুস্থ বাবা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছেন। ঝুমকি পাশে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ঝুমকির স্বামী তখন পুলিশটির কাছে এসে বলল—নিয়ে যান আপনাদের টাকা। ঐ তো সব ছড়ানো আছে নিয়ে যান। যারা আসল চোর তাদের ধরতে পারেন না। আর যত অত্যাচার আমাদের মতো নিরীহ মানুষদের প্রতি। যাদের দুবেলা দুমুঠো ভাত জোটে না তাদেরকে অত্যাচার করতে, শাসন করতে খুব ভালো লাগে তাই না। আপনি কি মালিকের অভিসন্ধির কথা তো একবারও চিন্তা করলেন না।

পুলিশটি মাথা নীচু করল। কোন কথাই মুখ দিয়ে বের হল না। শুধু একটা সরি বলে বেরিয়ে চলে গেল। ঝুমকি ডুকরে কেঁদে উঠল। স্বামীর কোলে মাথা রেখে বলল আর কত পরীক্ষা দেবো বলতে পারো। স্বামী কোন কথা না বলে শুধু মাথায় বিলি কাটতে লাগল।

তোমার ঘুম দেখছি ভেঙে গিয়েছে। এতক্ষণ তো ঘুম পাচ্ছিল। এই ঘটনা তাহলে তোমাকে ঘুম ভাঙাল। কি হাসছ যে। আসলে তুমিও তো ওদের সেই মনের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছো। সেই কবিতাটা তোমার মনে পড়ে। সেই 'পূজারিনী'র সেই ক'টা লাইন

''কেঁদে ওঠে লতা-পাতা
ফুল পাখি নদী জল
মেঘ বায়ু কাঁদে সবি অবিরল

কাঁদে বুকে উগ্রসুখে যৌবন-জ্বালায়-জাগা অতৃপ্ত বিধাতা!

পোড়া প্রাণ জানিল না কারে চাই।
চিৎকারিয়া ফেরে তাই—কোথা যাই
কোথা গেলে ভালবাসাবাসি পাই?
হু হু করে ওঠে প্রাণ, মন করে উদাস-উদাস,
মনে হয় এ নিখিল যৌবন আতুর কোনো প্রেমিকের ব্যথিত হুতাশ!
চোখ পুরে লাল নীল কত রাঙা, আবছায়া ভাসে, আসে আসে—"

কি আবার চোখ বুজলে? ও চোখ বুজে শুনছিলে। না-না আর অনুরোধ করো না। আর পারা যায় না। বেশ বাবা বেশ তোমার কথা মতোই ওটা শোনাচ্ছি। আর কি মনে আছে। সেই কবে কলেজ জীবনে বলেছি। ভুল হবে না আশা করি। একটু শোনাচ্ছি কিন্তু। কি যেন কবিতাটা। ও হ্যাঁ মনে পড়েছে—'বারাঙ্গানা'।

''দেবতা গো জিজ্ঞাসি
দেড় শত কোটি সন্তান এই বিশ্বের অধিবাসী—
কয়জন পিতা-মাতা ইহাদের হ'য়ে নিষ্কাম ব্রতী
পুত্রকন্যা কামনা করিল? কয়জন সৎ সতী?
ক'জন করিল তপস্যা ভাই সন্তান-লাভ তরে?
কার পাপে কোটি দুধের বাচ্চা আঁতুড়ে জন্মে মরে
সেরেফ পশুর ক্ষুধা নিয়ে হেথা মিলে নরনারী যত
সেই কামনার সন্তান মোরা! তবুও গর্ব কত?
শুন ধর্মের চাঁই—
জারজ কামজ সন্তানে দেখি কোনো সে প্রভেদ নাই!
অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ পুত্র হয়।
অসৎ পিতার সন্তান ও তবে জারজ সুনিশ্চয়!"

কি সব বলেছি তো। এখনো তাহলে মনে আছে কী বল? সে একদিন গিয়েছে। তুমিই আমাকে বলার জন্য উৎসাহ দিয়েছিল। পুরস্কারও পেয়েছিলাম। তবে সেটা তোমারই কৃতিত্ব বেশি। আরে ভোর হয়ে আসছে। চন্দ্রদেব আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসছে। একি তোমার ছবিটা দেওয়াল থেকে ভেঙে পড়ল কেন? যা কাঁচগুলো ভেঙে গেল। ওঃ কি বীভৎস। কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন। সত্যি কোথা থেকে কি হয়ে গেল। হঠাৎ সামান্য কারণে আমি তোমাকে হত্যা করলাম। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও। সত্যি আমি ভুল করেছি। তুমি তো সব দেখতে পাচ্ছো। ওঃ এই রাত জীবনে যে আর কতদিন কাটাতে হবে সেটা বলতে পারো। তুমি আমাকে তোমার কাছে তাড়াতাড়ি টেনে নাও। মনের শান্তি একদম পাচ্ছি না।

সেই কথাময় কুয়াশারা

সুরজিৎ রায়

(প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৫)

(এক)

অনেকদিন পর আবার মুক্তি পেলাম। এখন বিকেল। বড় ছাদ পেরিয়ে একটা ফাঁকা মাঠের ওপর এলাম। কয়েকটা ছেলে খেলাধূলা করছে। মাঠের দিকে বড় বাড়িটার গায়ে লেখা সত্যচরণ ছাত্রাবাস। 'নস্ট্যালজিয়া কাকা।' মাঠে দু'জন বসে গল্প করছে। তাদের একজন চেঁচিয়ে বলল কথাটা। একটু কাছে গেলাম কি বলছে শুনতে। সে দেখি শুয়ে পড়ল। ঘাসে গড়াগড়ি খেতে খেতে বলল, 'ওঃ, সেই ঘাস। সেকেন্ড ইয়ারে ঠিক এখানে বডি ভাসিয়ে একটা পাগলা ক্যাচ নিয়েছিলাম। মনে আছে তোর চিনু?'

পাশের জন পা ছড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘাসে বসে আছে। এ বোধহয় চিনু। দুজনেরই মাথায় কাঁচাপাকা চুল। চিনু বলল, 'অগ্রদূত ক্লাবের সঙ্গে খেলায়। আতি রে, কি দুরন্ত একটা সময় এখানে ফেলে গেছি। আর এখন দ্যাখ। জীবন পচে গেল। জ্বালিয়ে দিল সবাই মিলে। অফিসে বস আর বাড়িতে...'

'একদম সংসারের কথা নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করবি না।' আতি যার নাম সে চিনুকে থামিয়ে বলল, 'চল টিভি রুমে আমাদের শোয়ার ব্যাবস্থা দেখে আসি। আজ রাতে গান চালিয়ে নাচব।'

চিনু হালকা শ্বাস ছেড়ে বলল, 'তোদের কাছে এই অক্সিজেনটুকুর জন্য এই দিনটার অপেক্ষায় থাকি।'

'কি লাভ হচ্ছে তোকে অক্সিজেন দিয়ে? সারাবছর সংসারের কোমা থেকেই তো বার করতে পারছি না। এই রিইউনিয়ন ছাড়া তোর পাত্তা পাওয়া যায়? একটাও কবিতা লিখেছিস গত পাঁচ বছরে? পত্রিকার জন্য কিচ্ছু লিখলি না। আজ একটা কাজ করে দিতে হবে তোকে। পরে বলছি।'

চিনু আর কিছু বলল না। ওরা উঠে পড়ল। আতি বলল, 'তোর ছাব্বিশ নম্বর রুমের কবিতার শ্রোতা জয়দীপ আসতে পারে।' 'সিরিয়াস?' 'হ্যাঁ, আমেরিকা থেকে ফিরেছে, ওর মা মৃত্যুশয্যায়। আসতে পারবে কিনা শিওর না।' ওরা কথা বলতে বলতে ছাত্রাবাসের দিকে চলে গেল।

চারিদিকে ভেসে বেড়াতে বেড়াতে সঙ্গী সাথীদের থেকে নানা দিকের নানান খবর পাচ্ছি। এখানে অনেকদিন আগে একবার ছিলাম, এই ছাত্রাবাস তখন নতুন। তার আগেও ছিলাম এখানে। তখন ছাত্রাবাসেরও জন্ম হয়নি, জঙ্গল চারিদিকে। তারও আগে, আরও আরও অনেকবার খ ছিলাম আমি। বারবার বন্ধন আর মুক্তিই তো আমার অনন্ত জীবনের ওঠাপড়া।

'আমি অক্সিজেন' চিনু ছেলেটার কানের কাছে এসে বললাম। বিকেলে মাঠে বসে আমার নাম করে কি যেন বলছিল। এখন রাত্রি অনেকটা হয়েছে। একা একটা ঘরে চেয়ারে বসে একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছে। সামনের চৌকিতে একরকম অনেক বই রাখা আছে। আমি হাওয়ার খেয়ালে জানলা দিয়ে ঢুকে কথাটা বলেছি।

সে আমার কথাটা প্রথমে শুনল 'অগ্নি সেন'। 'অগ্নি সেন? এলি? কইরে অগ্নি?' বলে এদিক ওদিক খোঁজ করল। আজই লম্বা নারকেল গাছটার পাতা থেকে বেরিয়েছি। এখনই অগ্নি শুনলে ভালো লাগে না। আগুন মানেই তো আবার বন্ধন। হুট করে এত তাড়াতাড়ি অগ্নিসাক্ষী করে কার্বন ডাই অক্সাইড হতে চাই না। বললাম, 'আমি অনেক ছোটো, তাই দেখতে পাচ্ছ না। আমি অক্সিজেন গ্যাসের একটা অণু।' চিনু ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকাল। পকেটে থেকে মোবাইল বার করে দেখল। আমার কথায় একটু যেন ভয়ও পেয়েছে মনে

হল। ভুত ভাবছে নাকি? জোরে বলল, 'কে ভাই জানলার ওপারে? কোন ইয়ার? রানিং বোর্ডার? আয় কাজে হাত লাগা।' কানের কাছাকাছি ছিলাম। বললাম, 'কি কাজ তোমার?'

চিনু এবার চমকে উঠে জানলার বাইরেটা দেখে এল। একটু আনমনে থাকল। কেউ কাছাকাছি নেই। হালকা হাসল। জানলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'শোন ভাই, দুপাত্র খেয়েছি। তাও বাইরে থেকে খেয়ে হেঁটে এসেছি। তবে হ্যালুসিনেট করছি না বস। কেসটা বল তো। এই কথাগুলো আসছে কিভাবে?'

বললাম, 'বলব? শুনবে? সাড়ে তিনশো কোটি বছর আগে থেকে আসছে কথাগুলো। তখন পৃথিবীর বয়েস মাত্র একশ কোটি বছরড়আমি জন্মেছি সেই সময়। এটাও আমার ঠিক বয়েস নয়, এটা মুক্তি পাওয়ার বয়েস। তার আগেও আমরা ছিলাম। নানান বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে। আমরা মিলেজুলে থাকতে ভালবাসি। অক্সাইড, হাইড্রক্সাইড নাম শুনেছ নিশ্চয় আমার বনেদি পরিবারের। বারবার আমরা সংসার পাতি। একটা সংসার তোমাদের খুব চেনা-জল।'

চিনু হেসে বলল, 'বিরাট ভূমিকা রে। তুইও খেয়েছিস নাকি? যা, তোর কথাই ধরলামঠতুই ওটু, তুই ছোটু, তোর গায়ে কোটি বছরের ট্যাটু। কোটি বছর আছিস তো কি হয়েছে? মোটে সাড়ে তিনশো বছর আগে আবিষ্কার অক্সিজেনের। আবিষ্কারকের নাম জোসেফ প্রিস্টলি। নামকরণ করেছেন আঁতোয়া ল্যাভয়েসিঁয়ে। তার আগে তোর নামই ছিল না। কাজ করতে দে এখন।'

'নাম না থাকলে কাজ তো বন্ধ হয় না। পৃথিবীতে আমরাই সবচেয়ে বেশি পরিমাণ আছি—জানো? তাবলে, পৃথিবীতে আমার অধিকার বেশি এমন নয়। আমার কাজ বেশি। তোমার কী কাজ? বসেই তো আছো।'

'সামনে পত্রিকার স্তূপ দেখতে পাচ্ছিস না? কাল সকালে প্রাক্তনীদের মধ্যে বিতরণ হবে। পত্রিকায় সংশোধনীর একটা বাজে দায়িত্ব পড়েছে। সাতাশ পাতায় কবিতার লেখক প্রমথেশ বড়াল নামটা প্রমথেশ বেড়াল হয়ে ল্যাজ গুটিয়ে বসে আছে। এখন কারেকশন পেন দিয়ে দুশোটা বেড়ালের গোঁফ ছেঁটে বড়াল করতে হবে।'

'বুঝলাম। কাজে বিরক্ত হও।'

'মোটেও না। আর, বুঝেছিস যখন জ্বালাচ্ছিস কেন?'

'আমি জ্বালাই না, জ্বলতে সাহায্য করি।'

'বাঙ্গালি ভূত, তার জ্ঞান কত! আঁতেল।'

যা ভেবেছি, ভূত ঠাউরেছে। বললাম, 'আমাদের মৃত্যু নেই। তাই অক্সিজেনের ভূত বলে কিছু হয় না। বিশ্বাস করতে পারছো না এখনো?'

সে জোরে শ্বাস টেনে পত্রিকাটা রেখে বলল, 'কি করে করব কাকা? যুক্তি দে। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। একটা অণু তো তুই? এই যে আমি তোর কথা শুনতে পাচ্ছি, এই সাউন্ড ওয়েভ কে তৈরি করছে? তোর পিকোমিটার রেঞ্জের চেহারার একটা অণু? যত্তসব।'

'অত হিসেব জানিনা গো। বাঁশির সুর তো বাতাসেই তৈরি হয়। আমি যখনই কথা বলছি, আমার চারপাশ থেকে কোটি কোটি অক্সিজেন অণু আমাকে সাহায্য করছে। প্রয়োজন হলেই চুপচাপ অন্যের প্রয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়ি আমরা।'

চিনু একটা সিগারেট বার করে বলল, 'সাহায্য? ব্যাস, কয়েক কোটি প্রতিবেশীর কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে গেলি তো? আমার মতো দায় ঠেলতে থাক এবার।'

'এটা তো প্রকৃতিতে স্বাভাবিক। কৃতজ্ঞতার দায় বা দাবী কোনোটাই প্রকৃতির নিয়ম নয়। তোমাদেরও অনেকে এ রকম আছো, অত হিসেবি নয়, কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া মানুষ। তাদের শরীরে বোধহয় অক্সিজেন বেশি থাকে।'

'আবার জ্ঞান! আমার বৌয়ের মতো । এলাম একটা দিন মাথা ফাঁকা করতে... আমার বেশি অক্সিজেন দরকার নেই। যা ভাগ।'

আমি তো খারাপ কিছু বলিনি। খারাপ ব্যবহার আর অবিশ্বাস করল চিনু। প্রকৃতিতে মানুষ ছাড়া আর কোথাও অবিশ্বাস বলে কিছু নেই। অলৌকিক বলেও কিছু হয় না, তারা মানুষের আবিষ্কারের অপেক্ষায়।

খারাপ লাগা চেপে ভালভাবে বললাম, 'তুমি কিছু

মনে না করলে বিশ্বাস করানোর জন্য একটা ইয়ার্কি করতে পারি তোমার সঙ্গে?'

চিনু উত্তর না দিয়ে ফস করে দেশলাই জ্বালাল। ঠিক হচ্ছে কিনা জানিনা, তবু একটু পরে আমার দলবল মিলে একটু দূরে সরে গেলাম। কয়েক সেকেন্ড পরেই ফিরতাম। কিন্তু গণ্ডগোলটা তার মধ্যে হয়ে গেল। চিনু একদিকে কাত হয়ে চেয়ার থেকে মেঝেতে পড়ে গেল। হাতের মোবাইল আর সিগারেট ছিটকে পড়ল কোনায়। মোবাইলটা বেজে উঠল তখন। আমরা সবাই দৌড়ে গেলাম ওর নাকের কাছে। আমি দু'বার বুকের ভেতর থেকে ঘুরে এলাম। অক্সিজেনই আছি এখনও। মানুষের প্রশ্বাসে পাঁচটায় একটা অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড হয়ে যায়—আমি দু'বারেও হইনি। মোবাইল বেজে যাচ্ছে।

ওর বন্ধুরা কয়েকজন ঘরে ঢুকল একটু পরে। 'একিরে' 'কতক্ষণ পড়ে আছে মেঝেতে?' 'আর কেউ ছিল না এ ঘরে?' 'জল আন ভাই' 'চিনু' 'চিন্ময়' 'চিন্ময়দা'... অনেক কথায় আর ঘূর্ণি বাতাসে ভরে গেল ঘর। বাতাসের ধাক্কাতেই আমি জানলা গলে ছিটকে গেলাম বাইরে।

(দুই)

'কেমন আছো চিন্ময়?' আবার সেই রিনরিনে গলা।

'অক্সিজেন?' একটু থেমে বললাম, 'কাল রাত্রে কি তোর সঙ্গেই কথা বলছিলাম? জানিস, তোর বাংলা নাম অল্পজান।'

'বিশ্বাস করছ? অবশ্য না করলেও চলবে এখন।'

'প্রকৃতিতে বিশ্বাস হারানো পাপ।' ধীরে ধীরে বললাম, 'আমাদের, মানে মানুষদের একটা বাজে অভ্যেস আছে, প্রকৃতিকেও মাঝে মাঝে স্বীকার করার আগে পরীক্ষা করি।'

মাথা ঘুরে চেয়ার থেকে পড়ে গিয়েছিলাম পত্রিকার স্মৃতিচারণ বিভাগ পড়তে পড়তে। কয়েক মিনিট অজ্ঞান হয়ে ছিলাম। জ্ঞান ফেরার পর অবশ্য আর সমস্যা হয়নি। সুমন আতিরা আমাকে চোখের আড়াল করেনি।

রাতের খাওয়ার পর টিভি রুমে বসেছিল গল্পের আসর। আতিয়ার, সুমন, সুখেন, হাসান, বালু, হীরেন—আমার সোনালী সময়ের সঙ্গীরা। সম্পূর্ণ মুক্ত জীবন কাটিয়েছি এদের সঙ্গে। হিসেব, মুখোশ, ভদ্রতা, লৌকিকতা; এই শব্দগুলোর প্রবেশ নিষেধ ছিল সে জীবনে। মাঝরাত পর্যন্ত অতীতের মাটিতে হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে যেন ধীরে ধীরে ফিরে পাচ্ছিলাম। কখন ঘুমিয়েছি জানি না। শেষ রাতের দিকে স্বপ্নে দেখলাম আতি, সুজন, অগ্নি আর জয়দীপ তাস খেলছে। পাশে বসে দেখছি। আমার মুখে অক্সিজেন মাস্ক। আমাকে খেলায় নিচ্ছে না ওরা। তাসগুলোয় কোনো ছবি নেই। কোনোটায় লেখা মাঠ, কোনোটায় টিভি রুম, কোনোটায় ছাদ... ক্যান্টিলিভার... কলতলা... ডিনামাইট ...

ঘুম ভাঙল, যখন ভোরের আলো ফুটছে। একটা চাদর গায়ে দিয়ে মাঠে এসে দাঁড়ালাম। শিশিরে ভেজা ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে মনে হল কুড়ি বছর পিছিয়ে চলে গিয়েছি। আমি অন্য মানুষ।

'আমাকে ক্ষমা করো চিনু।' সে বলল।

'প্রকৃতি তো ভুল করে না।' আমি ভোরের কুয়াশার মতো ঘন গলায় বললাম।

'বজ্রপাত, ভূমিকম্প এগুলো কী বলোতো?'

'কী?'

'প্রকৃতির সংশোধন। অনেক সময় ধরে জমে ওঠা অসাম্যকে সাম্যে আনার সংশোধন।'

ঘষা কাচের মতো ভোর চোখ মেলছে। আলোর ফোটন কণার আভাসে মিশে আছে নতুন অক্সিজেনদের মুক্তির বার্তা—সবুজ পাতার ক্লোরোফিলের কোলে। পৃথিবীর সমস্ত জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার অনন্য অঙ্গীকার। একটা আনকোরা সকালের গন্ধ আমার প্রশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে ভরিয়ে তুলছে আমার অন্তর।

দূরে কলেজ বিল্ডিঙের পাশে একটা আবছা অবয়ব দেখতে পেলাম। আমাদের ছাত্রাবাসের দিকে এগিয়ে আসছে। হাঁটার ধরণ দেখে দূরের অতীত মনে পড়ল। জয়দীপ, আমার স্বরচিত কবিতার মনোযোগী শ্রোতা।

রিনরিনে গলাটা অনেকক্ষণ চুপ। ফিসফিস করে বললাম, 'আছিস?' কেউ কোনও উত্তর দিল না।

বললাম, ''অক্সিজেন, তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভালো হলো রে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। ভুলেই গিয়েছিলাম পুড়তেও অক্সিজেন লাগে।''

বড় করে শ্বাস নিলাম। মনে হল, সমস্ত কথা বলা অক্সিজেনের অণু আমার ভেতরে নতুন অনুভূতির অনুরণন সৃষ্টি করছে। বাইরের এই ভৈরবী নৈঃশব্দে আমার ভেতর থেকে পুড়ে ঝামা হয়ে যাওয়া শব্দেরা বেরিয়ে আসতে চাইছে—কবিতা হয়ে।

(তিন)

ইউক্যালিপটাসের পাতা থেকে ভোরের কুয়াশার সঞ্চয় একফোঁটা জল ঘাসে এসে পড়ল, টুপ্।

(এ গল্পে লম্বা নারকেল গাছ আর অক্সিজেন অণু ছাড়া বাকি সবকিছু কাল্পনিক)

A LIVING WITNESS : AN ESSAY THROUGH THE EYES OF A TREE

Sandip Goldar
(Entry Year : 2002)

I am a simple banyan tree located at the vicinity of an ancient Shiv temple. I am sharing the story of my life as a living witness to the world around me.

I was planted as a seed some three decades ago by the local priest of the temple, Tapu Thakur in the close proximity of the temple. He surrounded me by a bamboo fence to protect me from goats and other dangers. He also watered me daily. With the passage of time, I began to grow first into a small tree and then gradually into a large tree stretching my roots deep underground. From a tiny seed I was converted into a huge, dense and shady tree giving shelter to numerous creatures like birds, insects etc. A round cemented seat was constructed around me by the temple authority to facilitate people to sit there. The people who came to visit the temple used to sit under me. Children used to play under me hanging from my trunks. Their shouts and energy injected new life force into me. During evening time, few old peoples used to gather under me counting and rejoicing their old memories. I became witness to numerous gossips and talks of people of different age groups. One night, as few teenagers came there with bottles of beers and enjoyed their time under me. I witnessed their frenzy, their shouts, their swearing curses. Soon it became their regular affair, they used to spend their time there and often created ruckus. Then one day the temple authority held a meeting under me raising concern over the rise of anti-social activities in the vicinity of the temple. A local political representive suggested that to stop such activities the only way is to cut down the tree. I was alarmed by this suggestion but then Tapu Thakur intervened and protested this idea of cutting dawn the tree. He gave a brilliant suggestion of doing night patrol around the temple to stop such activities. His suggestion was accepted by the local committee and arrangements were made with the help of local police to appoint two civic volunteers there during night hours. I was much relieved and once again I felt grateful to Tapu Thakur for becoming my saviour. Days were passing quickly. One day I noticed an old man wearing glasses walking unsteadily, came to me and sat under me. He was touching my trunk and taking a feel. I recognised him as my nourisher and saviour, the same Tapu Thakur. He was trying to hold me with his hands with tears in his eyes. The next day I saw people gathering there and few

women lamenting. It took me some time to get that my saviour was no longer alive, he had passed away the night before when his corpse was placed under me as as fulfilment of his last wish, I shed few leaves under his feet to pay tribute to this great man my creator nourisher saviour. With his demise, I witnessed the passing away of a generation, an era. I was very much sad for few days and then one day I noticed a flock of parrots who took shelter in my branches. I was much amused to see the little ones of parrot screeching playfully hopping over my branches. Of late, as huge solar light post has been eracted near me lighting the surroundings around me. One day I overhead some conversation that the state government is going to take control of the temple and a corridor will be build around it and for that purpose I may be cut down. I am not very much sure of my fate or my existence, as in the process of urbanisation or progress of mankind, we are the mute ones who are always sacrificed first. Unprogressive and fools like Tapu Thakur will be not there always to fight for me and protect me. But even after my sacrifice in the name of progress of mankind, people will some day lament for me when they will face the wroth of nature in the form of scorching heat of sun rays 42^0C temperature (Feels like 52).

[Temperature today : Kotasur : Date 13.06.2024]

টুকরো কথা

(আমাদের সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের whatsapp গ্রুপে সারা বছর ধরে যে লিখিত কথাবার্তা চলে তাদের মধ্যে থেকে আলগোছে তুলে নেওয়া কিছু কথা এবং কিছু বার্তা এখানে রাখা হল। বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বলা এই 'টুকরো কথা' নিতান্তই আমাদের ঘরোয়া আলাপচারিতা।)

রিইউনিয়নে আগত সকল সদস্যদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। অংশ গ্রহণ করতে না পারার জন্য আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।

—মানব যশ, ১৭.১২.২০২৩

(আমাদের গ্রুপে সম্ভবত এটাই মানবদার শেষ পোস্ট।)

খুব খুব ভালো লাগাটা গায়ে জড়িয়ে আছে। পিছনে ফেলে এলাম অতি প্রিয় একরাশ মুখ ও মূহুর্ত আর সঙ্গে নিয়ে এলাম আগামী এক বছর চলার মতো অনেক বাতাস। বার বার বলতে ইচ্ছে করছে আবার—''আসিব ফিরে পরম প্রিয় মায়ের কোলে''।

—ভূমানন্দ সিনহা, ১৭.১২.২০২৩

সমস্ত দাদাদের প্রণাম এবং বন্ধু ও ভাইদের ভালবাসা জানাই...

আমি এখনো পর্যন্ত আমার জীবনে, সেরকম সফলতা পাইনি... তবে ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত অনেক কিছু সঞ্চয় করেছি, আমাদের সকলেরই প্রিয় সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের কাছ থেকে। তাই আমার জীবন ধন্য...

—মানবেন্দ্র রায়, ১৮.১২.২০২৩

সফলতা মানে?

আর্থিক, সামাজিক, আত্মতুষ্টি, পরমার্থিক কি ধরনের সফলতা?

তুমি সবাইকে ভালোবাসো। তোমাকে, তোমার উৎসাহ, হোস্টেলের প্রতি তোমার আবেগ-কে আমরা ভালোবাসি। তুমি তো ১০০ শতাংশ সফল।

—গিরিধারী দাস, ১৮.১২.২০২৩

(মানবেন্দ্র-র উদ্দেশ্যে)

REUNION CUP 2023
SCORE CARD

RAKESH SNC - 82/4 (12over)
AMIT SNC - 83/2 (8.4 Over)
AMIT SNC won by 8 wickets.
Man of the match–AMJAD
Best Batsman–SUSHIL
Best Bowler–BUBUL
Best Fielder–MOLOY

—বুবুল সরকার, ১৯.১২.২০২৩

Next time 80's, 90's 2000' 2010' dhoshoker competition hok, cricket match. Graph-e jemon dekhachhe, strength index-er ratio kore competition hobe, jemon 45 range-er (1990 doshok) strength index 70 er kachhakachhi, aar 55 er (1980's) strength index 60 er kachhakachhi; tahole 1990's

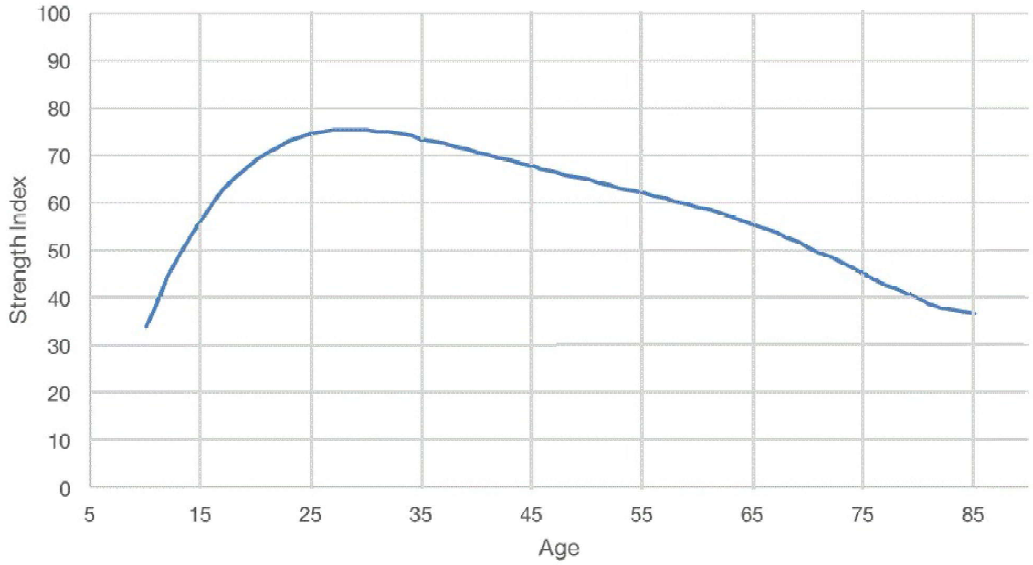

doshok prothome bat kore 105 korle 1980's ke 105 x (60/70) ba 90 run korte hobe… counting ageing factor... just kidding.

—পলাশ সিনহা, ১৯.১২.২৩

(রিইউনিয়ন কাপ-২০২৩ ক্রিকেট ম্যাচ সম্পর্কে)

DRS এর বদলে PS method. Idea খারাপ নয়।

তবে ফিল্ডিংয়ের সময় কি হবে? যখন বুড়োরা ব্যাট করবে তখন কি বাউন্ডারি লাইন এগিয়ে আসবে!!

—সন্দীপ দাস, ১৯.১২.২৩

তখন বোলার আর কিপার থাকবে।

—শিবাশিস মণ্ডল, ১৯.১২.২৩

বুবুল, গিরিধারী, সুরজিৎ মনে করিয়ে দিল আমাদের রিইউনিয়ন-২৩ আজ এক সপ্তাহ হয়ে গেল। সপ্তাহের কাজের ফাঁকে ফাঁকে ১৭ তারিখটা মনের মধ্যে বারে বারে ফিরে আসছিল। আর সেই দিন আরও ভুলতে দিচ্ছে না 'আনন্দদীপ'। পুরোটা এখনও পড়া হয়ে ওঠেনি। একটু একটু করে পড়ছি আর সেই দিনগুলোর সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিচ্ছি, অনুভব করছি, স্মৃতির অতল তলে ডুব দিচ্ছি, হোস্টেলের গন্ধ গায়ে মেখে বিভোর হচ্ছি।

কাল পড়ছিলাম তরুণ, বুবুল আর মানবের ক্রিকেট নিয়ে লেখা। পড়ে মনে হলো আমাদের পরবর্তী কালে ক্রিকেট নিয়ে উম্মাদনা চরমে উঠেছিল। আমাদের সময়েও খেলা হতো। তবে বোধহয় এতটা নয়।

১৯৮৩ সালে prudential cup, ১৯৮৫-তে rathmans cup-এ ভারত চ্যাম্পিয়ন হলো। শারজা তো ছিলই। এরপরে এল ১৯৮৭ world cup- reliance cup, যেটা ভারতে হয়েছিল। সেই বছরই আমরা এলাম হোস্টেলে। ক্রিকেট নিয়ে তখন চরম উদ্দীপনা। যার ঢেউ আছড়ে পড়ল হোস্টেলে এবং কলেজেও। তখন কলেজে ছিলেন দুই অল্পবয়সী অধ্যাপক। প্রদোষদা ছিলেন zoology- র আর অজয়দা ছিলেন botany-র অধ্যাপক। ওনারাই হলেন প্রধান উদ্যোক্তা। শুরু হলো intra class tournament. First year আর second year এর আর্টস, সাইন্স আর কমার্সের তিনটে তিনটে করে ছটা টীম। Third year এর একটা টীম আর ইলেভেন-টুয়েলভ মিলিয়ে একটা টীম। মোট আটটি টীম। প্রতিযোগিতা শুরু হলো ১৯৮৮-র ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে। খেলা হয়েছিল ডিউস বলে। অসমান পিচের উপর ম্যাট পেতে। আম্পায়ার হতেন প্রদোষদা আর অজয়দা। আমার মনে আছে আমাদের বেশির ভাগ

ছেলেরই স্পোর্টস-শু বা নিদেনপক্ষে কেডসও ছিল না। কিন্তু তাতে উৎসাহের বিন্দুমাত্র খামতি ছিল না। খালি পায়ে প্যাড পরে দাঁড়িয়ে পড়তাম ব্যাট নিয়ে। আমরা যখন 3rd year তখন মনে আছে বাজারের একটি ছেলে হেলমেট নিয়ে এসেছিল। সেই আমাদের প্রথম ক্রিকেটের হেলমেট হাতে নিয়ে দেখা। ১৯৮৮, ৮৯, ৯০ তিন বছরই খেলেছিলাম। সেই সব স্মৃতি আজও অমলিন।

সেসময় আমরাও বাইরে টুর্নামেন্ট খেলেছি। তবে তরুণদের মত অতটা নয়। জালিবাগান, বাঙালপাড়া। একবার জয়দীপ আমাদের নিয়ে গিয়েছিল তাদের গ্রাম কামরাঘাটে খেলতে।

সেদিন গৌতমদা (মণ্ডল) ফুটবল খেলা হয় কি না জিজ্ঞাসা করছিল। ১৯৮৮ থেকেই ক্রিকেটের চাপে হোস্টেলে ফুটবল আস্তে আস্তে ব্যাকফুটে চলে যেতে থাকে।

ছুটির দিনে বসে অনেক আবোল তাবোল লিখে ফেললাম। আসলে এবারের রিউনিয়নে গিয়ে ভাইগুলোকে খুব ভালোবেসে ফেলেছি। ওদের আবেগটা আমাকে ছুঁয়ে ফেলছে বার বার।

আজকের মতো

—সন্দীপ দাস, ২৪.১২.২০২৩

Darun likhechis Bondhu, purono diner sob katha mone pore gelo.

—আকাশ ভট্টাচার্য, ২৪.১২.২০২৩

দাদা লেখাটা পড়ে খুবই ভালো লাগলো এবং এটা পড়ে আগের হোস্টেলের খেলার বিষয়ে অনেক কিছু জানা গেল। মাঝে মাঝে এইরকম কিছু লেখা পেলে মন্দ হয় না...

—সুনীত সাহা, ২৪.১২.২০২৩

আমাদের সময় মানে ৮২-৮৪, ফুটবল ছিল হোস্টেলের প্রাণ। বিকাল হলেই মাঠে নেমে পড়তাম। ওই সময় বেশিরভাগ ছেলে ফুটবল ভালো বাসত। আমরা বাঙাল পাড়ায় মাঠে একটা খেলা হত, সেখানে খেলতাম। আমি তো মাঝে মাঝে আশেপাশের এলাকায় খেলতে যেতাম। হোস্টেলের অনেকে আমার সঙ্গে গেছে। কলেজ টুর্নামেন্ট-এ খেলতে যেতাম। কলেজ টীম-এ চান্স নিয়ে অনেক ঝামেলা হত। টাউন ভার্সেস হোস্টেল। কাঞ্চন, ত্রিলোক, আমানদা, সুব্রত, শিশিরদা, আর কার নাম বলব।

—গৌতম কুমার মণ্ডল, ২৬.১২.২০২৩

সীতাংশু, কল্লোল এরাও খেলতো। তবে কল্লোল ক্রিকেট বেশ ভালো খেলত। আমরাও মহা উতসাহে ক্রিকেট, ফুটবল, ক্যারাম, তাস সবেতেই নেমে পড়তাম। আসলে বিনোদনের মাধ্যমই ছিল খেলা না হয় সিনেমা দেখা। আর গ্রান্ড ফিস্টের দিন ক্যান্টিলিভারে নাচ। তা যতই ছন্দহীন হোক না কেন? বৃষ্টির দিনে ফুটবল—সে স্বাদ কী যায় রে ভোলা!!

—ভূমানন্দ সিনহা, ২৬.১২.২০২৩

বুলিদা সেদিন গুলো ভুলে যাওয়া যায় না। Sunday বৃষ্টি হলেই সকলের টিফিন খেয়ে মাঠে নেমে পড়া।

—গৌতম কুমার মণ্ডল, ২৬.১২.২৩

Reunion খুব সুন্দর হয়েছে, খুব ভালো কাটিয়েছি। ঐ দিনটা সারাজীবন স্মৃতি হয়ে থাকবে।

—দিলীপ কুমার সরকার, ২৯.১২.২০২৩

For all members–

আজ আমি ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ মহারাজের সাথে দেখা না হলেও তার কাছে ছাত্রাবাসের স্মরণিকা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছি। একই সাথে শুভেচ্ছাবাণী পাঠাবার জন্য বলেছি।

—জলদবরণ দত্ত, ৩১.১২.২০২৩, বিকেল ৪.০২

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ মহারাজের সাথে কথা বলা সম্ভব হল।

—জলদবরণ দত্ত, ৩১.১২.২৩, বিকেল ৭.০২

গামছা

নামটা দেখে অদ্ভুত মনে হচ্ছে তো!! এ আবার কি শিরোনাম!!

হ্যাঁ আজকের বিষয় হচ্ছে গামছা। এই গামছা বস্তুটি হোস্টেল জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। বাড়ি থেকে হোস্টেলে ফিরে, কলেজে ক্লাস করে নিজের রুমে এসে (হোস্টেলে কিন্তু কেউ ঘর বলতাম না, ওটা ছিল রুম), 'শান্তি'-তে সিনেমা দেখে হোস্টেলে ঢুকে প্রথমেই যে জিনিসটা হাতে তুলে নিতাম তা হলো গামছা। গামছা সেই যে গলায় বা ঘাড়ে উঠতো, সহজে নামতো না। বদিদার দোকানে চপ মুড়ি বা পুরি তরকারী খেয়ে ঢক ঢক করে জল খেয়ে গামছায় মুখ মোছার পরিতৃপ্তি ছিল আলাদা। আর ক্যান্টিলিভারে গামছা ঘাড়ে বসে পেপার পড়েনি এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া ভার। আবার গরমকালের সন্ধ্যাবেলায় লুঙ্গি বা পায়জামা গেঞ্জি পরে বাঙাল পাড়ার ভিতর দিয়ে ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে আড্ডা মারতে যাওয়ার সময়ও সেই গামছার অধিষ্ঠান ঘাড়ে।

আর সেই সব গামছার রকমফের ছিল কত। মুর্শিদাবাদের ছেলেরা আনত বেলডাঙার তাঁতের গামছা। মালদা থেকে আসতো চৌখুপি একটু মোটা গামছা। দুর্গাপুরের বন্ধুদের কাছে থাকতো বাঁকুড়ার গামছা, যা একটু উন্নত মানের বলে গণ্য হতো। আবার কেউ কেউ নিয়ে আসতো একটু খাটো মাপের মোটা তোয়ালে গোছের গামছা। সেটা কখনও হতো একরঙা গেরুয়া আবার কখনও চেক কাটা। আমাদের এক বন্ধুর গামছা এতটাই বড় ছিল যে সেটা কোমরে পরবার পরে মোটামুটি গোড়ালি পর্যন্ত নেমে আসত। মোটামুটি বলতে পারো গামছার চেহারা দেখে বোঝা যেত কে কোন এলাকা বা জেলা থেকে এসেছে।

খুব মনে পড়ে চান করার আগে তেল মেখে পায়জামার উপর কোমরে গামছা কষে বেঁধে এক রাউন্ড ক্যারম খেলার কথা। আবার ওই বেশে কামালদার সঙ্গে একটু টেবিল টেনিস খেলে গা ঘামিয়ে তারপর টিউবওয়েল টিপে মাথায় বালতি বালতি জল ঢালা।

গামছা ছিল আমাদের পরিষেবা প্রদানকারীদেরও সর্বক্ষণের সঙ্গী। ঘোষালদা, বিশুদা, প্রফুল্লদা বা দিলীপদাদের চেহারা তো গামছা ছাড়া মনেই পড়ে না। ওনাদের ঘাড়ে সব সময়ের সঙ্গী ছিল ওই বস্তুটি। রান্না করতে করতে বা খাবার পরিবেশনের সময় মুখের ঘাম গামছায় মুছে একটা শের বিড়ি ধরিয়ে ওঃ সে কি সুখটান!!

নিতাইদারও ছিল গামছা। এখন ভাবি নিতাইদা কি পরিশ্রমটাই না করতেন। অতবড় হোস্টেলের নিচের থেকে উপরে পুরোটা ঝাঁটা দিয়ে রোজ পরিষ্কার করা ছিল নিতাইদার কাজ। তখন সেই নীল-লাল গামছা থাকতো নিতাইদার কোমরে। আর যখন ঝুল ঝাড়া হতো, তা উঠে যেত মাথায়। আর সবশেষে চান করে গামছায় গা মুছে ভাত খেয়ে হোস্টেলে ঢোকার মুখে সিঁড়ির সামনে বেঞ্চে বসে নিতাইদার চোখ বুজে বিড়িতে টান দেওয়ার দৃশ্য এখনও চোখে ভাসে।

গামছা ছিল খেলার মাঠেরও সঙ্গী। বিশেষ করে সকালবেলায় কলেজ যাওয়ার আগে যখন মাঠে গা ঘামানো হতো। আর আমাদের বন্ধু নিউটনের গামছা পরে ব্যাটিং করা, সে আর এক দৃশ্য ছিল। গোটা মাঠ ফাঁকা। হোস্টেলের দেওয়াল ঘেঁসে নিউটন ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে। আর ট্যামপা বল করছে। নিউটন সমানে বল পিটিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে নিজেই দৌড়ে বলটা কুড়িয়ে নিয়ে আসছে। আমার মনে হয় গোটা পৃথিবীতে নিউটনই প্রথম এবং শেষ ক্রিকেটার যে গামছা পরে নেট প্র্যাক্টিস করত।

অনেক আবোলতাবোল লিখে ফেললাম। কেউ কিছু মনে করো না যেন। আজকের মত এখানেই...

—সন্দীপ দাস, ০২.০১.২০২৪

১৯৯৮ ব্যাচের এক দাদাকে ভালোবেসে গামছা বলে ডাকা হয়। মার খাওয়ার ভয় এখনো আছে তাই নামটা আর বললাম না।

—অরবিন্দ শী, ০৩.০১.২০২৪

'আনন্দদীপ' পড়ছি আর মনে হচ্ছে বন্ধু ভাই আর দাদাদের সাথে রুমে বসে গল্প শুনছি, সুন্দর...

—উদয়ন পাল, ০৫.০১.২০২৪

সালটা ১৯৬৬। ১৬ই আগস্ট। সকালের দিকে বাড়ি হতে হোস্টেলে এসেছি। হোস্টেলের মেঝে তখনো ঠিকমতো তৈয়ারী হয়নি। একটি ঘরে চারজনের থাকার ব্যবস্থা। আসা মাত্রই তৎকালীন অধ্যক্ষ ডঃ কে ডি রায় অন্যদের জানালেন আমার উপস্থিত হবার কথা। যেন কতদিনের পরিচিত। সন্ধ্যা বেলাতেও ঘুরে গেলেন হোস্টেল। ফাঁকা মাঠের মধ্যে হোস্টেল। কাছেপিঠে জন-বসতি নেই। রাতে উঠতে হলে ফাঁকা মাঠেই কাজ সারতে হবে। এদিকে শোয়ার ব্যবস্থা তিনফুট কাঠের চৌকি। বাড়িতে মেঝেতে বিছানা করে শোয়ার অভ্যাস। রাতে পাশ ফিরতে গিয়ে মশারী সহ মেঝেতে চিৎপটাং। পরের দিন অধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রথমে এসেই জিজ্ঞাস্য, 'কারা রাতে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিলিস?' বুঝলাম এটাই স্বাভাবিক।

—জলদবরণ দত্ত, ২৮.০৭.২০২৪

স্বর্গীয় মানবদার বাড়ি যাওয়ার সুবাদে পলাশদা, শিবাশীষদা, পাপুদা, আকাশদা, তুষারদা, গোপীনাথদা, চঞ্চলদা ও সুজিতদার সঙ্গে দেখা হল, আলাপচারিতা হল। একবারের জন্যেও মনে হল না, আমি (ওনাদের সকলের কাছেই, সুজিতদা ব্যতীত) একেবারেই নতুন এক ভাই। বরং মনে হল, আমি ওনাদের অনেক অনেক দিনের চেনা, এটাই আমার কাছে বৃহৎ পাওনা। একেই বলে এক বৃহত্তম একান্নবর্তী পরিবার (সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের স্বহৃদয় সম্পন্ন আবাসিকবৃন্দ)।

—বরুণ মুখার্জী, ২৬.০৮.২০২৪

আমার সুজনসখা প্রাক্তনীবৃন্দ,

বিগত অল্প কিছু দিনের ব্যবধানে আমাদের সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের কয়েকজন প্রাক্তনীকে হারালাম। মনটা সত্যি সত্যিই ভারাক্রান্ত ছিল। দিলীপদা চলে গেলেন। সন্তোষ ও অরিন্দম এত অল্প বয়সে চলে গেল। তাঁদেরকে আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো চোখেই দেখেনি কিন্তু প্রায় সকলের মধ্যেই স্বজন হারানোর ব্যাথা অনুভব করেছি।

আমরা যারা আশির দশকে মাধ্যমিক পাশ করেছি, তাদের একটা কবিতা পাঠ্য ছিল, মোহিত লাল মজুমদারের 'কালবৈশাখী'। সেখানে একটি লাইন ছিল: ''ওরই মাঝে আছে কালপুরুষের সুগভীর পরামর্শ'' লাইনটাকে শিক্ষক মহাশয়রা খুবই গুরুত্বপূর্ণ লাইন বলতেন। আমরা মুখস্থ করতাম, লিখতাম, ইত্যাদি এবং ইত্যাদি।

পর পর দু'দিনে ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনা আপাত দৃষ্টিতে 'ছোট্ট' মনে হলেও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। আমি সকল প্রাক্তনীদের আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে একদম প্রথম থেকে 'কার্যকরী কমিটির' সাথে যুক্ত আছি। এখানে আমার ভূমিকা খানিকটা নৈবেদ্যর উপরে বাতাসার মতো বা সেতুবন্ধে কাঠবিড়ালির মতো। না থাকলেও কিছু এসে যেত না।

সে যাইহোক, যে দুটি ঘটনা আমাকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিলো সেটা হল—

ঘটনা-১

আমাদের প্রয়াত প্রাক্তনী দিলীপদার ছেলে আমাদের ছোট ভাই 'সুপ্রিয়' আমাদের সাথে যোগ দিল। সুপ্রিয় খুবই অল্প সময়ের জন্য আমাদের আবাসিক ছিল। সাধারণ ভাবে অত অল্প সময়ে ওর মধ্যে ছাত্রাবাস সম্পর্কে আবেগ তৈরি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু শ্রদ্ধেয় দিলীপদা নিশ্চয়ই সুপ্রিয়র মধ্যে আমাদের প্রিয় ছাত্রাবাস সমন্ধে একটা আবেগের বীজ বপন করতে পেরেছিলেন। সুপ্রিয় সেই বীজকে সযত্নে লালন করেছে। তাই দিলীপদা, আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। উপর থেকে আশীর্বাদ করুন। ভাই সুপ্রিয়-কে জানাই আন্তরিক ভালবাসা।

ঘটনা-২

আমাদের ছোট ভাই সন্তোষের অকাল ও অস্বাভাবিক প্রয়াণে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ওর ছেলের পড়াশোনার জন্য কিছু আর্থিক সহায়তার আবেদন করা হয়েছিল। আমাদের মধ্যে অনেকেই তাদের সাধ ও সাধ্যমতো সহযোগিতা করছে বা করবে। কিন্তু আজ আমাদের একজন প্রাক্তনী গিরিধারী দাস-এর (এন্ট্রি ইয়ার ২০০০) স্ত্রী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সহায়তা করেছে। ও আমার থেকে অনেক ছোট, আমার ছোট্ট বোনের

মতো। তবুও আমি অবনত মস্তকে আমার ছোট্ট বোনের মানসিকতা-কে শ্রদ্ধা করি ও প্রণাম জানাই।

আমরা সত্যি সত্যিই একটা বৃহত্তর পরিবারের সদস্য হতে চলেছি। ঘটনা দুটি আমাদের সকলের দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা বাড়িয়ে দিল। এই মধ্যবয়সে এসে 'কালপুরুষের সুগভীর পরামর্শ' বোধহয় অনুধাবন করতে পারলাম। আজকের দিনে আমি সেই সকল ভাই/দাদা ও বন্ধুদের অনুরোধ করব যারা এখানে এসেও কিছু মান অভিমানে একটু দূরে দূরে থাকছো বা থাকার চেষ্টা করছো, তারা আবার স্বমহিমায় ফিরে এসো। দেখো ভালো লাগবে। সকলে ভালো থেকো। ভালোবাসা নিও।

—শোভন কুমার মুখোপাধ্যায়, ১২.০৮.২০২৪

আমি, সুপ্রিয় মজুমদার, খুবই অল্প সময়ের জন্য কলেজ এবং হস্টেল-এর প্রাক্তনী হলেও আমার সদ্য প্রয়াত বাবার মুখ থেকেই এই কলেজ এর প্রতিষ্ঠার মুহূর্তের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, আর শ্রদ্ধেয় ড. কে ডি রায় মহাশয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টার কথা এত শুনেছি যে, আমি দীর্ঘ সময়ের ছাত্র না হলেও বাবার কাছে ঘটনার পরম্পরা আর গল্প শুনে, তাঁর বন্ধুদের, যেমন জলদবরণ কাকু, প্রভাত কাকু, বিশ্বনাথ কাকুর কথা শুনে কবেই যেন এই কলেজটাকে আমার একান্ত আপন বলে মনে হয়েছিল। বাবার মৃত্যুর পর সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের প্রাক্তনীদের আমার বাবার প্রতি ভালবাসা সেই টান, বন্ধনটাকে যেন আরও দৃঢ় করে দিল।

—সুপ্রিয় মজুমদার, ১২.০৮.২০২৪

অভিনন্দন—অভিনন্দন—অভিনন্দন

সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের এক্সিকিউটিভ কমিটির অনুমতি অনুসারে আমরা কয়েকজন প্রাক্তনী প্রয়াত সন্তোষ পালের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য অন্যান্য প্রাক্তনীদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলাম। আনন্দের সঙ্গে জানাই আপনারা অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবে আমাদের সত্যানন্দ পরিবারের অন্যতম প্রয়াত সদস্যের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এসেছেন। আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে সাময়িকভাবে অর্থনৈতিক অসুবিধায় পড়া আমাদের প্রয়াত প্রাক্তনীর পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি। আজ তার পরিবারের হাতে ৭৫০০০ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে। সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে আমরা আমাদের ছাত্রাবাসের মহান ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে পেরেছি। আমরা এখনও বেঁধে বেঁধে আছি—এ বার্তাও সম্মিলিত ভাবে দিয়েছি। সকল প্রাক্তনীকে আহ্বায়কদের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

—ভূমানন্দ সিনহা, ০১.০৯.২০২৪

আমাদের প্রত্যেকের জীবনের কয়েকটা বছর সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের কোলে কেটেছে। কারোর কাছে সেই স্মৃতিগুলো বেদনাময়, কারো কাছে carrier গড়ার সোপান, কারো কাছে প্রথম প্রেমের কবিতা, কারো কাছে বাঁধন ছাড়া যৌবনের মধ্য দিয়ে নতুন পৃথিবী কে জেনে নেওয়ার, চিনে নেওয়ার সময়।।

আমরা প্রত্যেকে নিজের মত করে বেঁচেছি ঐ কয়েকটা বছর।

কেউ প্রতিষ্ঠিত হয়েছি, কেউ হইনি। তবে ঐ কয়েক বছরের শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই নিজেদের জীবনের গাড়ি এগিয়ে নিয়ে চলেছি।।

সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের দোষ কোথায়? ছাত্রাবাস আমাদের দু'হাত ভরে দিয়েছে স্নেহ, মায়া, মমতা ও ভালোবাসা।

দিয়েছে নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ।

পরবর্তী সময়ে আমরা আপডেটেড হয়েছি। পেয়েছি স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে পুরনো সম্পর্কগুলোকে খুঁজে।

দাদাদের হাতে যে reunion এর বীজ বপন হয়েছিল, তা আজ মহীরুহে পরিণত। আরো অনেক নতুন নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে reunion এর মাধ্যমে।

আমি নিজেও হয়ত সবাইকে চাক্ষুষ দেখিনি, কিন্তু ১৯৬৬ থেকে আজকের দিন পর্যন্ত দাদা ভাইদের ভালোবাসার সম্পর্কটাকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিয়ে যেতে চাই।

আত্মকেন্দ্রিক, অনুভূতিহীন, গতানুগতিক সম্পর্কের

বাইরে গড়ে ওঠা এই সম্পর্ক অনেক বেশি দৃঢ়, স্নেহময় ও ভালোবাসা মিশ্রিত এক পানীয়ের মতো।

যে পান করেছে, সে এর স্বাদ জীবনে ভুলতে পারেনি, আর পারবেও না।।

—বুবুল সরকার, ০৮.১০.২০২৪

(আজ এ পর্যন্তই। সম্পাদকমণ্ডলী কথা দিচ্ছে আগামী দিনে এই 'টুকরো কথা'-র আয়তন আরও বিস্তৃত হবে।)

যারা 'আনন্দদীপ', প্রথম সংখ্যার (২০২৩) জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তার সম্পূর্ণ তালিকা এখানে রাখলাম। আমরা তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

জলদবরণ দত্ত (১৯৬৬)
রজত কুমার ব্যানার্জী (১৯৯৮)
অনাথনাথ ঘোষ (১৯৭৫)
দিলীপ সরকার (১৯৭৫)
দেবনারায়ণ ব্যানার্জী (১৯৭৫)
নির্মল সাহু (১৯৭৭)
পরিতোষ মণ্ডল (১৯৮২)
গৌতম কুমার মণ্ডল (১৯৮২)
দেবদুলাল দাস (১৯৮৩)
মহঃ ঈশা (১৯৮৪)
পলাশ ব্যানার্জী (১৯৮৪)
শিবাশিস মণ্ডল (১৯৮৫)
সন্দীপ দাস (১৯৮৭)
অনিমেষ মণ্ডল (১৯৯৩)
সুরজিৎ রায় (১৯৯৫)
মানস বিশ্বাস (১৯৯৫)
জয়ন্ত ধর (১৯৯৬)
বিশ্বজিৎ সাহা (১৯৯৭)
মহঃ নূর আলী (১৯৯৭)
সুকান্ত পাল (১৯৯৭)
রুদ্র প্রতাপ মুখার্জী (১৯৯৯)
অরবিন্দ শী (২০০০)
গিরিধারী দাস (২০০০)
গোলাম আম্বিয়া (২০০০)
কৌশিক ভট্টাচার্য (২০০৪)
সন্দীপ মণ্ডল (২০০৪)

৫ই অক্টোবর—এক বাতিঘরের কাহিনি

(এ কাহিনির লেখক স্বয়ং সত্যানন্দ ছাত্রাবাস। আমাদের গ্রুপে একটা দিনের কয়েকটা হোয়াটসঅ্যাপ পোস্ট। লাইট হাউস যেমন উত্তাল সমুদ্রে ভাসমান জাহাজদের আলো দেখিয়ে পথ চিনতে সাহায্য করে। এ কাহিনি তেমন কোনো বাতিঘর হয়ে আগামীদিনে আমাদের পথ দেখাক।)

আমার নাম—তীর্থ চৌধুরী, আমার সত্যানন্দের ছাত্রাবাসের প্রথমবর্ষ ২০০৭-২০১০। আমার মোবাইল নাম্বার ৯৬০৯৬৭৭২৩৬ / 9609677236।

দুর্গাপুর কোন দাদা বা ভাই আছেন বা আছো আমার ৬ ইউনিট যে কোন গ্রুপের রক্ত দরকার। খুব আর্জেন্ট কালকের মধ্যে লাগবে। প্লিজ হেল্প।

(ফরোয়ার্ড করা মেসেজ)

—পলাশ সিনহা, 05.10.2024, 11.44 am

এখনো কেউ জানালো না।

বুবুল/পলাশ??

—জলদবরণ দত্ত, 05.10.2024, 11.57 am

(এর কিছুক্ষণ পর পলাশ সিনহা, তীর্থ চৌধুরীকে গ্রুপে প্রবেশ করায়।)

Akashke phone koro, or baridurgapur.

—অমল দত্ত, 05.10.2024, 12.13 pm

Khonj nichhi sir. (জলদবরণ দত্ত-র পোস্ট-এর উদ্দেশ্যে)

—পলাশ সিনহা, 05.10.2024, 12.34 pm

তীর্থ, দুর্গাপুরে অনেকেই আছে। আকাশদা, কিরীটীদা, আশুতোষ, সোমনাথ, bubul..... এদেরকে কন্টাক্ট করে খোঁজ নে।

—পলাশ সিনহা, 05.10.2024, 12.36 pm

Ei matro kotha holoTirtha r sathe. Sob thikthak, no tension.

—আকাশ ভট্টাচার্য, 05.10.2024, 12.59 pm

@ আশুতোষ, @ সোমনাথ (তীর্থর উদ্দেশ্যে)

—আবু তাহের মাসুম রাজা, 05.10.2024, 12.30 pm

তীর্থর সাথে কথা হয়েছে। ১ ইউনিট shortage আছে। রুদ্র মুখার্জী ১ ঘন্টা পর যাবেও blood দেবে।

এর বাইরে যদি পোস্ট opetation blood লাগে, তাহলে আমার schooler ম্যাডাম দেবে।

—বুবুল সরকার, 05.10.2024, 01.07 pm

দুর্গাপুরের আকাশদা যোগযোগ করে কথা বলেছে তীর্থর সাথে। আকাশদা ও রেডি blood দেবার জন্য। আকাশদা আজ সন্ধ্যায় তীর্থর সাথে হসপিটালে দেখা করতে যাবে। এখন ডিউটিতে থেকেও তীর্থর সাথে যোগযোগ রেখে চলেছে।

Hats of আকাশদা।

Hats of রুদ্র

ফুল সুন্দর হও

—বুবুল সরকার, 05.10.2024, 01.13 pm

সকল দাদা, অনেক অনেক ধন্যবাদ

—তীর্থ চৌধুরী, 05.10.2024, 01.32 pm

রুদ্রদা এখনি পৌঁছালো। ১ ইউনিট রক্ত কমপ্লিট।

—তীর্থ চৌধুরী, 05.10.2024, 02.35 pm

খুব টেনশনে ছিলাম। সত্যানন্দ আশীর্বাদে সব প্রবলেম ঠিক হয়ে গিয়েছে। সব দাদারা আমার সব সময় খবর নিচ্ছে। সোমবার ওটি হবে সেইদিন দাদারা উপস্থিত থাকবে। এখন শুধু সত্যানন্দ চরণে শত কোটি প্রণাম জানাই।

—তীর্থ চৌধুরী, 05.10.2024, 6.05 pm

আজ একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। একটু তাড়াতাড়ি স্কুলে এসে ফোনে দেখলাম দুটো কল। তার মধ্যে একটা কল শোভনদা। কথা হল। এরপর সাগরদা। তাড়াতাড়ি গিয়েছিলাম স্কুলে প্রাক্-শারদীয়া অনুষ্ঠানের জন্য। অনুষ্ঠান শুরুর কিছুক্ষণ পরে হোস্টেল গ্রুপে একটা মেসেজ : আমি তীর্থ ...পুরোটা পড়তে পারিনি কারণ আমার ফোনেই গান চলছিল। কিছু পরে সিনিয়র মোস্ট জলদদার মেসেজ। না তখনও বুঝতে পারিনি। অনুষ্ঠান শেষের আগে একটা ব্রেকে পড়লাম।

জলদদার মেসেজ-এ একটা উৎকণ্ঠা দেখলাম। কতটা হোস্টেল-দরদী হলে একজন প্রবীণ মানুষ এমন কাতরাতে পারেন। দুটো নাম আমার আর পলাশদার। অন্য ফোনে গান দিয়ে যোগযোগ শুরু করলাম। প্রথমে আকাশদাকে বিষয়টি নিশ্চিত হতে ফোন করে খবর নিতে বললাম। পরের ফোন রুদ্র। ওকে যতদূর আমি চিনি এই পরিস্থিতিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে ওস্তাদ। ডিউটি থেকে তখন বাড়ি ফিরছে। বলল দাদা আমি কন্টাক্ট করে তোমাকে বলছি। ১০ মিনিট পর বলল আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাব blood দিতে।

এবার আকাশদা জানাল তীর্থ-র সাথে কথা হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা hospital যাবে ও যত blood লাগে arrange হয়ে যাবে। (যদিও আকাশদা নিজে তখন ডিউটিতে) আমাদের বিদ্যালয়ের এক ম্যাডামও operation পরবর্তী blood দিতে স্বেচ্ছায় রাজি।

বেলা ২.৩০-এ রঞ্জিতকে ফোন। পত্রিকা নিয়ে, বেচারি তখন ও স্নান খাওয়া করেনি, তবু ও হাসিমুখে সব কথা শুনল।

মাঝে রুদ্র জানাল হসপিটাল চলে এসেছে, কাজ হয়ে গেছে। এখন ঘন্টাখানেক ওখানে থাকবে।

না, নিজেকে জাহির করার জন্য নয়, শুধু বোঝাতে চাইছি সত্যানন্দদেবের এই রকম প্রচুর সন্তান একটা খবর পেলেই পাশে দাঁড়ানোর জন্য চলে আসবে। অতীতে এর অজস্র উদাহরণ আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

শুধু নিজেকে এই পরিবারের সাথে একাত্ম করে নিন। দেখবেন কাউকে না পেলেও ভাই বা দাদারা আছে।

ও হ্যাঁ, এত registration এর আবেদন আমি করি শুধু আপনাদের এই একাত্মবোধের জন্য। একবার reunion এ আসুন, জোর দিয়ে বলছি এক অদ্ভুত টান আপনাকে ছাত্রাবাসে টেনে নিয়ে আসবে প্রতিবছর।

সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, একে অপরের পাশে থাকুন।

—বুবুল সরকার, 05.10.2024

Ex-Boarders of Satyananda Chatrabas Registered in Reunion-2024

JALADBARN DUTTA	1966	SHOVON KUMAR MUKHOPADHYAY	1982
ANUP MITRA	1966	BANAMALI MONDAL	1983
PRADIP KUMAR GHOSH	1967	MD. MOSTAFA KAMAL	1983
PRABHAT KUMAR CHAKRABORTY	1967	MD HAMIDUL HAQUE	1983
ANATH NATH GHOSH	1975	SIRAJUL ISLAM	1983
DILIP SARKAR	1975	MILAN KUMAR SAHA	1983
TUSHAR KANTI BHATTACHRJEE	1979	SUBRATA CHOWDHURY	1983
ASHIS KUMAR MUKHERJEE	1980	GOUTAM BANERJEE	1983
KUMAIRUDDIN SHAIKH	1980	ABUL BASAR	1983
BHUMANANDA SINHA	1981	ARUN KUMAR SEN	1983
HARADHAN MUKJERJEE	1981	ABDUS SATTAR	1983
ADYANATH GHOSH	1981	PALASH BANERJEE	1984
ANARUL HAQUE	1981	SAGAR KUMAR DAS	1984
EFTEKHAR HOSSAIN	1982	SADEQUE ALI BISWAS	1984
PARITOSH MONDAL	1982	SIBASHIS MONDAL	1985
KANCHAN KUMAR GHOSH	1982	ABDUL KHALEQUE	1985
SUNIL GHOSH	1982	MANORANJAN GHOSH	1985
GOUTAM KUMAR MONDAL	1982	LAKSKMAN SAHA	1985
SHYAMASADHAN MUKHERJEE	1982	ASADUZZAMAN	1985

GADADHAR DAS	1986	FOZLUL KORIM	1988
ARUP KUMAR DUTTA	1986	BIPLOBJIT GHOSH	1989
PRASUN GHOSH	1986	GOPINATH SAHA	1989
SHISH MOHAMMAD	1986	RAJENDRA DEY	1989
TUSHAR GARAIN	1986	SIDDHARTHA GHOSH	1989
GOUTAM CHANDA	1986	DEBRAJ BANARJEE	1989
BIBEK RANJAN GHOSH	1986	SUDAM ROY	1989
BIJAY KUMAR MONDAL	1986	MANAS KUMAR GHOSH	1990
SAILAJA BANERJEE	1986	SAMIM KABIR	1990
PRABIR PAL	1986	PALASH ROY	1990
APURBO GHOSH	1986	BASANTA KUMAR MONDAL	1990
ARIJIT SARKAR	1986	KARUNA SINDHU MANDAL	1990
PARTHA SARATHI DAFADAR	1986	BINOD SARKAR	1990
DIPAK KUMAR DAS	1986	BIPLAB DATTA	1990
SANDIP DAS	1987	BRINDABAN DAS	1991
KIRITI BANERJEE	1987	MANGAL KR. SARKAR	1991
AKASH BHATTARCHYA	1987	ARJUN MONDAL	1991
SUJOY KUMAR DAS	1987	SHYAMAL BISWAS	1991
AMAL KUMAR DUTTA	1987	SUJIT KUMAR DAS	1992
CHANCHAL ROY CHOWDHURY	1987	TAPAS SAHA	1992
AJAY CHAKRABORTY	1987	JOTIN GHOSH	1992
TUSHAR MONDAL	1988	TUHIN DEY	1993
LAXMAN CHANDRA GHOSH	1988	SUDHIRANJAN GANGOPADHYAYA	1993
HEDAYETULLA	1988	SUPRIYA MAJUMDAR	1993

SUMAN CHAKRABORTY	1993	UDAYAN PAL	1994
SEKHAR MAJUMDAR	1993	TAPAS SAHA	1994
UDAY KUMAR NAYAK (CLASS 11)	1993	BUBUL SARKAR	1995
ASHIS KUMAR SEN	1993	SURAJIT ROY	1995
BIMAL KUMAR PAUL	1993	ARIFUJJAMAN	1995
SUNIRMAL SAHA	1993	BIDHAN SARKAR	1995
ANIMESH MONDAL	1993	TARUN SAHA	1995
NAYAN MONDAL	1993	SOMENATH GHATAK	1995
MOSAROF HOSSAIN	1993	MANAS BISWAS	1995
BIMAL CHOWDHURY	1993	PINAKI RANJAN GHOSH	1995
ASIT BARAN DUTTA	1993	AULAD HOSSAIN	1995
PALASH SINHA	1994	WAQUIF MD. SAHIN	1995
CHANDAN BISWAS	1994	KAMALESH GHOSH	1995
PRABODH MONDAL	1994	PRITHWIS DAS	1995
KUNAL KANTI SINHA ROY	1994	SWASTIK MONDAL	1995
BARUN MUKHARJEE	1994	AMAR MONDAL	1995
GOUTAM MONDAL	1994	MONOJIT LAHA	1995
RAJKUMAR GHOSH	1994	DEBANGSHU MONDAL	1995
RAJESH DAS	1994	JAYANTA DHAR	1996
PARTHO PRAMANIK	1994	ABU TAHER MASUM RAJA	1996
DEBASHIS GHOSH	1994	ASHUTOSH DAS	1996
PRIYA RANJAN ROY	1994	BAPPADITYA PRAMANIK	1996
SEMIM SIDDIK	1994	BIKROM PAL	1996
KAJAL CHAKRABORTY	1994	SUDIP GORAI	1996

NURUL ALAM	1996	KOUSHIK SINHA	1997
ANIRUDDHA BISWAS	1996	PRANAB SAHU	1997
ARABINDA MONDAL	1996	DEBAKINANDAN MAJEE	1997
PRANAB PAL	1996	AVIJIT SAHA	1997
SUDHA KRISHNA MONDAL	1996	BHABANI PRASAD DAS	1997
ARUN HALDER	1996	MALEK ALI	1997
RAJDIP GHOSH	1996	SUKURUDDIN MALLICK	1997
SUBRATA BAYEN	1996	KERAMAT ALI	1997
MANABENDRA ROY	1997	NUR ALI (CHOTO)	1997
SUKANTA PAL	1997	PROBHAKAR SARKAR	1997
BISWAJIT SAHA	1997	RAKESH BHAKAT	1998
KRISHNA DAS LAYEK	1997	TARAKNATH MONDAL	1998
MALAY DAS	1997	RABIUL ISLAM	1998
SUBHENDU MONDAL (ENGLISH)	1997	SUSHANTA DAS	1998
SWAPAN BAGDI	1997	DIPAYAN DEY	1998
ARUP MISHA	1997	AMIT KUMAR DAS	1998
SAHIDUL HAQUE	1997	SOMPRAKASH MUKHARJEE	1998
MRIDUL HAQUE	1997	SRIMANTA GHOSH	1998
ZAMIL AKHTER	1997	RUDRA MUKHARJEE	1998
FARUQUE AHMED	1997	BISWANATH SAHA	1998
MUKTAR ALAM	1997	INDRANIL GHOSH	1998
HIMADRI GHOSH	1997	AHASAN HABIB	1999
SUBHENDU MANDAL (MATH).	1997	JAYANTA GHOSH	1999
NUR ALI (BORO)	1997	ABDUL KADER	1999

BARUN GHOSH	1999	ARUP SHEE	2001
MRINMOY ROY	1999	BISWAJIT DEY	2001
ACHINTA SHIL	1999	NASIMUDDIN	2001
AJIM SK	1999	MAIDUL ISLAM	2001
TUSAR MONDAL	1999	BADRUL ALAM	2001
SHYAMAL SAHA	1999	HEDAYETULLAH MANDAL	2001
ZIAUR RAHAMAN	1999	RAJEN MONDAL	2001
ENAMUL KABIR	1999	SASIKANTA BHAKAT	2001
MIR HOSSAIN	1999	RANJIT KUMAR SEN	2002
SAMSUL SEIKH	1999	SUBRATA KUMAR SAHA	2002
SUMIT MONDAL	1999	CHANDAN SARKAR	2002
GIRIDHARI DAS	2000	SANDEEP GOLDAR	2002
ARABINDA SHEE	2000	PARTHA MONDAL	2002
GOLAM AMBIA	2000	AMJAD HOSSAIN	2002
DEBABRATA GHOSH	2000	HASANUZZAMAN	2002
RAJESH GHOSH	2000	BAHLUL HAQUE	2002
MURARI KRISHNA SAHA	2000	KANCHAN BHATTACHARJEE	2002
MOSAROF HOSSAIN	2000	TAPESH KUMAR PAL	2002
SOUMEN DEY	2000	SUSHOVAN GHOSH (BBA)	2002
SUNIT SAHA	2001	DEBASHISH LALA	2002
KALIKINKAR MONDAL	2001	KRISHNA CH. DHIBAR	2003
PINTU MUKHARJEE (BBA)	2001	ARPAN MUKHARJEE (BBA)	2003
DIBYENDU MONDAL	2001	ANANTA MONDAL	2003
NILOTPAL BAGDI	2001	JAHANGIR HOSSAIN	2003

BISHNU CHARAN PAL	2004	BROJO SUNDAR PAL	2005
PRAVAS CHANDRA DEY	2004	BRINDABAN BHOLLA	2005
PARTHA SARATHI PAL	2004	SUSHIL KUMAR PAL	2005
KOUSHIK BHATTACHARJEE	2004	PRANAB GHOSH	2005
AMAR GUPTA	2004	PRASENJIT DEY	2005
HAFIJUL KABIR	2004	SUBRATA THANDAR	2006
SHAMIM REJA	2004	EZEHAR ALAM	2006
ADITYA DEY	2004	SANDIP MONDAL	2006
SURESH PAL	2004	RATAN BAGDI	2006
BIDYUT PAL	2004	INDRAJIT NANDI	2006
ASHOK KONAI	2004	NIRAJAN PAL	2007
PRAVAT PAL	2004	TIRTHO CHOWDHURI	2007
BAPINUR NASER	2004	AJAY DEY	2007
JIBAN SARKAR	2004	SAPTAM MANDAL	2007
MAIDUL ISLAM	2004	SIDDHARTA MONDAL	2007
JIBANANNANDA BHATTACHARJEE	2005	SATYAJIT BAGDI	2007
UTTAM GHOSH	2005	SUDIP MONDAL	2013